স্বপ্ন বিলাস
দর্পণ কবীর

১

সিমিকে অবাক করে দিতে খুব ইচ্ছে হল। প্রায় এক বছর হলো ওর সাথে কোন যোগাযোগ নেই। ওর সাথে দেখা নেই। গত এক বছরে ওকে একবারও ফোন করিনি। ওর সাথে যোগাযোগ হঠাৎ করেই বন্ধ করে দিই। প্রথম প্রথম ও আমার খোঁজ নেবার চেষ্টা করেছে। আমার বন্ধু আনিসের কাছে ম্যাসেজ রেখেছে ওকে ফোন করার জন্য। আমি জানি, উপেক্ষা সিমিকে ভীষণ খেপিয়ে তোলে। ইচ্ছে করেই আমি ওকে উপেক্ষা করেছি। একটা পর্যায়ে সিমি আমার সাথে যোগযোগ করার আর চেষ্টা করেনি। গত এক বছর সিমির কথা যেন ভুলেই গিয়েছিলাম। আজ ওর কথা খুব মনে পড়ছে। কেন পড়ছে জানিনা। আমার কারো প্রতি দুর্বলতা জন্মে না। কিংবা হয়তো জন্মে, আমি বুঝতে পারি না। অন্য সবাই সম্পর্ককে যেভাবে ধরে রাখেন বা সম্পর্কের একটি রূপ দেন, আমি সেভাবে ধরে রাখতে পারি না। রূপ দিতেও পারিনা। কোন সম্পর্ক ধরে রাখার চেষ্টা আমি করি না। এমনকি, কারো সাথে পরিচয় হলে তার সাথে আমার কী সম্পর্ক দাঁড়ালো তা নিয়ে মাথাও ঘামাই না। আমি আমার ভুবনেই সীমাবদ্ধ। নিজের সমস্যায় ডুবে থাকা নিঃসঙ্গ এক মানুষ আমি। সময় কত কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আমি সময়ের স্রোতে ভেসে চলা যেন উদ্দেশহীন খড়কুটো। আমাকে পরিচিতদের অনেকে 'আত্মকেন্দ্রিক' 'অহংকারী' 'অসামাজিক' ইত্যাদি বলেন। বন্ধুরা খেপে গিয়ে বলে,

'তুই নিছক একটা প্রাণী। বস্তুবাদ বা ভাববাদ কোনটাতেই তোকে ফেলা যায় না। এই পৃথিবীতে তোর অস্থিত্ব অর্থহীন'।

আমি তখন নিজের পক্ষ নিয়ে বলি,
‘আমার ভালো কোন দিক কি নেই?’
‘আছে, তোর হাসিতে জাদু আছে। তোর হাসির সামনে সব রাগ গলে যায়। আর তোর উপস্থিতিকে উপেক্ষা করা যায় না। এ দুটি জিনিস নিয়েই তুই আমাদের পছন্দের মানুষ হিসাবে আছিস’।
বন্ধুরা আমাকে পছন্দ করে। আমি বুঝতে পারি, বন্ধুদের কাছে আমার একটা ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়েছে। আমার অসহায়ত্ব ওদের সামনে মেলে ধরি না। ওরা আমাকে ভালোবাসে, করুণা করে না। ওরা যখন আমার প্রশংসা করে, আমি হাসির দমকায় ফেটে পড়ি। বন্ধুরা সুযোগ পেলেই আমার হাসির প্রশংসা করে। কিন্তু সিমি আমার হাসি একদম পছন্দ করেনা। আমি হাসলেই ও রেগে যেত। আর আমিও ওকে খুব রাগাতাম। সিমি কেন জানি, যে কোন বিষয়ে আমার ওপর চট করে রেগে যেত। অন্য সবার সাথে ও বিনয়ী, নম্র ও বিনীত। শুধু আমার সাথে ওর যত রাগ! আবার আমার সাথেই ও ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করতো। আমি কোনদিন ওর কাছে এর কারণ জানতে চাইনি। জানার ইচ্ছেও করেনি। ওর সাথে প্রায় দুই বছর এককাট্টা হয়ে ঘুরেছি। বন্ধুর মত দু’জন দু’জনকে সঙ্গ দিয়েছি। আমাদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল, নাকি তারচেয়েও বেশি কিছু? প্রশ্নটি মনে বিঁধে থাকলেও এর জবাব খুঁজে দেখিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে আমরা সবচেয়ে বেশি আড্ডা দিয়েছি। টিএসসির চত্বর, পাবলিক লাইব্রেরী, মধুর ক্যান্টিন, শাহবাগের আজিজ সুপার মার্কেট, নিউমার্কেট, গাউছিয়ায় ছিল আমাদের হরহামেশা যাতায়াত। অনেকগুলো দুপুর আমরা ব্যয় করেছি বিভিন্ন রেষ্টুরেন্টে। কথা, কথামালা, তর্ক-ঝগড়া বা সমঝোতার সব পাঠই ছিল আমাদের সম্পর্কের অধ্যয়নে। ওর সাথে আমি এতটা ঘনিষ্টভাবে মিশেছিলাম যে, অনেকে আমাদের প্রেমিক যুগল ভাবতো।

সিমির ক্লাসমেটরা আমাকে নিয়ে ওর সাথে ওসবের ইঙ্গিত দিয়ে রসিকতাও করতো। কেউ বিশ্বাস করতো না যে, আমাদের মধ্যে কোন হৃদয়ঘটিত সম্পর্ক নেই। এ নিয়ে সিমি মাঝেমাঝে আমাকে রেগে গিয়ে বলতো,

'তুমি আমার সাথে আর ঘুরবে না। ফোনও করবে না। তোমার সাথে আমার সম্পর্ক কী, এই প্রশ্ন করছে অনেকে।'

আমি ওর কথায় খুব হাসতাম। এতে ও আরো রেগে যেত। কখনো ও ভীষণ রেগে বাড়ি চলে যেত। আমি তখন কিছুই বলতাম না। চলে না যাবার জন্য বাধাও দিতাম না। কিন্তু রাতে ওর বাসায় ফোন করতাম। ও তখন স্বাভাবিকভাবেই আমার সাথে কথা বলতো। যেন কিছুই হয়নি। আমরা আবার দেখা করতাম। ঘুরতাম। কথার রঙধনু এঁকে, গল্পের ফানুস উড়িয়ে বা তর্ক-বিতর্কে আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা ঘুরে বেড়াতাম রিকশায়। ঢাকা শহরের বিভিন্ন গলিপথে আমরা রিকশায় ঘুরে বেড়িয়েছি। সিমি রিকশায় ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করতো। আমি ঘন্টা চুক্তিতে রিকশা ভাড়া করতাম। ও আমার সাথে ঘুরতে পছন্দ করতো। কিন্তু সুযোগ পেলেই বলতো,

'তোমার সাথে ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে না। কোন চার্ম নেই।'

আমি ওর এ ধরনের কথায় রা করতাম না। আমি জানি, ওর এ কথাটি সত্যি নয়। সত্যি কথাটি প্রকাশ করতে ও হয়তো উল্টোদিক দিয়ে শুরু করতে চায়। আমি বুঝতে পারি, আমার উপস্থিতি ওকে উচ্ছ্বসিত করে। কিন্তু মাঝেমাঝে ও আমার প্রতি নির্লিপ্ত ভাব দেখায়। মেয়েরা নিজস্ব ভাললাগাটুকু অপছন্দের মোড়কে ঢেকে রাখতে চায়। এটা হয়তো নিজেকে সংযত করার কৌশল। আমি সিমিকে খুব সহজে বুঝতে পারি। পড়তে পারি। আমার প্রতি ওর কপট রাগের আড়ালে যে অনুরাগের রঙধনু আছে, তা আমি জানি। কিন্তু আমিও ওকে বুঝতে দিই না। ওর যত রাগ বা

উপেক্ষা আমি নীরবে মেনে নিই। আমার প্রতি ওর যত রাগই থাকুক, যে কোন ব্যাপারে আমার ওপর ও নির্ভরও করতো সবচেয়ে বেশি। আজ সিমির কথা মনে হতেই ওর কপট রাগের মিষ্টি মুখটি মনে পড়ে গেল। সিমি আমাকে অনেক সময় উপেক্ষাও করেছে। আমাকে অনেকে উপেক্ষা করে। কেউ আমাকে উপেক্ষা করলে আমি বিষণ্ন হই না। উপেক্ষা আমার সয়। অবহেলা খুব চেনা। শিশু বয়স থেকেই উপেক্ষা, অবহেলা, অনাদর আমার খুব চেনা। আমার মধ্যে এ নিয়ে দুঃখ নেই। নিয়তির পরিহাস ভেবে সব মেনে নিই।

আমি দাঁড়িয়ে আছি একটি টেলিফোন বুথে। সিমিকে ফোন করে চমকে দেব আজ। তিন বছর আগে এমন একটি দিনে সিমিকে ফোন করে চমকে দিয়েছিলাম। সিমির সাথে পরিচয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমি ওকে ফোন করে ঘুরতে যাবার প্রস্তাব দিই। সেদিন আমিও নিজেকে নিজস্ব বৃত্ত থেকে বের করে এনেছিলাম। এটিই আমার জীবনের এ পর্যন্ত সবচেয়ে সাহসী কাজ। এর আগের দিন সিমির সাথে আমার পরিচায় হয় আনিসের মাধ্যমে। সেদিনটির কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সেদিন বিকেলে চাকুরির খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে আমি আনিসের মতিঝিলের অফিসে যাই। মতিঝিল এলাকায় গেলে আমি আনিসের অফিসে ঢুঁ মারি। আনিসের এক্সপোর্ট ইমপোর্টের বিশাল পরিসরে ব্যবসা। এটি ওদের পারিবারিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। ওদের প্রতিষ্ঠান ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, কোরিয়ার ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিশানারিজ আমদানি করে এবং দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করে। ওর অফিসে গেলে মনটা জুড়িয়ে যায়। সুন্দর অফিস। সেক্রেটারি, কর্মকর্তা-কর্মচারির ব্যস্ততা। আনিস আমার বন্ধু ভাবতে ভালো লাগে। আনিস আমাকে ওর অফিসে দেখে খুশিতে লাফিয়ে উঠে। চেয়ার ছেড়ে এসে জড়িয়ে ধরলো আমাকে। বললো,

‘আ-কা-শ! ঠিক সময়েই এসেছিস। তোকেই আজ দরকার।’

‘কেন ?’
‘দোস্ত, আমার এক আত্মীয়ার অনুষ্ঠান আছে শিশু একাডেমীতে। তোকে নিয়ে যেতে চাই।’
‘আমি যাবো কেন?’
‘এমনিই যাবি। একা যেতে চাচ্ছি না। তোর সাথে সিমির পরিচয় করিয়ে দেব।’
‘সিমি কে ?’
‘ও উঁচু মাপের আবৃত্তি শিল্পী।’
‘এবার তাহলে আবৃত্তি শিল্পীর শিকারে নেমেছিস!’
‘আহ্, অমন করে বলিস নে, বাপ। ও আমার বান্ধবীর ছোট বোন।’
‘কোন বান্ধবীর ছোট বোন?’
‘রিমির।’
রিমির কথা আমি জানি। রিমি আনিসের ডিপার্টম্যান্টে পড়তো। ওরা ক্লাসমেট ছিলো। আনিসের সাথে রিমির হৃদয়ঘটিত সম্পর্কও ছিল। ওদের সম্পর্কটা কোন পরিণতি লাভ করেনি। আনিসের সাথে সিমিদের পারিবারিক সম্পর্কটা আছে। আনিসের মুখ থেকেই এ সব কথা শুনেছি। প্রশ্ন করি,
‘বান্ধবীর ছোট বোনকে নিয়ে তোর এতো উৎসাহ কেন?’
‘তোর গলায় ওকে ঝুলিয়ে দেব, তাই।’
আমি হো হো করে হেসে উঠি।
‘তোর মত নিরস লোককে কে বিয়ে করবে বল? সিমি যদি তোকে দয়া করে, তবে তোর একটা হিল্লে হতে পারে।’
আনিস আমাকে ছাড়ে না। সন্ধ্যা পর্যন্ত ওর অফিসে আড্ডা মারি। সন্ধ্যায় ওর পজেরো জীপে চড়ে বেড়িয়ে পড়ি দু’ জনে। আনিসের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পেরে উঠা

যায় না। কিংবা আনিস ওর ইচ্ছাকে ব্যর্থ হতে দেয় না। ও যখন যা চায়, তা আদায় করে নেয়। বিপুল অর্থ-বিত্তের মধ্যে বড় হয়ে উঠা আনিস সবসময় নিজের ইচ্ছার রঙে নিজের মত করে ভুবন রাঙিয়ে নেয়। ওর জীবন ও যাপনের মধ্যে হাহাকার দেখা যায় না। ওর চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে ফারাক কম। ও যে স্বপ্ন দেখে, তা অপাংক্তেয় হতে দেয় না। হাত বাড়িয়ে পাওয়ার আনন্দ ও উপভোগ করে সহজভাবে। ও যা চায়, তা বেপরোয়াভাবে চায়। ওর পাওয়ার উপাখ্যান এতোটা ভারি যে, ও এখন না পাওয়ার কথা ভাবে না। ওর স্বপ্নের কোন সীমারেখা নেই। একটি স্বপ্ন ভেঙে আরেকটি স্বপ্ন গড়ার খেলায় ও সবসময় মশগুল। চঞ্চলতা ওর চরিত্রের বৈশিষ্ট। তবে ওর মধ্যে একটা সরলতাও আছে। ও যা চায়, সরাসরি চায়। কোন ভণিতা করে না। ও অকপটে নিজের দোষ স্বীকার করে। কোন কপটতা নেই। এ কারণে আমি আনিসকে খুব পছন্দ করি। মাঝেমাঝে আমার আনিসের মতো হতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আমি নিজের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারি না। আনিসের একটা অপছন্দনীয় প্রবণতাও আছে। ও হুটহাট মেয়েদের প্রেমে পড়ে যায়। এ পর্যন্ত এক ডজন মেয়ের নাম আমি জানি, যাদের প্রত্যেককে ও প্রেম নিবেদন করেছে। প্রাচুর্যের একটা শক্তি আছে। এই শক্তি আনিসকে অনেকবার জিতিয়ে দিয়েছে। ওর প্রেমের অফার খুব একটা রিফিউজড হয়নি। কিন্তু কোন মেয়েকেই ও ধরে রাখতে পারে নি। কিংবা ও ধরে রাখতে চায়নি। পেছনের পাতা পেছনে ফেলে আনিস সামনের দিকে ধাবমান। আনিসকে বলি,

‘তোর প্রেম প্রেম খেলা থামবে কবে?’

‘দোস্ত, এবার ঠিক করেছি, বিয়ে করে ফেলবো। আমি এখন ক্লান্ত পথিক।’

‘যাক বাবা, এই প্রথম তোর মুখে থামার কথা শুনলাম!’

আমরা শিশু একাডেমীর মিলনায়তনে গিয়ে দেখি, সিমির আবৃত্তি করে ফেলেছে। মঞ্চে অন্য একজন আবৃত্তি শিল্পী আবৃত্তি করছিল। আবৃত্তি শোনার আগ্রহ মানুষের কম। তাই মিলনায়তন ফাঁকা। আমরা সামনের দিকের চেয়ারে বসে অপেক্ষা করছিলাম সিমির আবৃত্তি শোনার জন্য। কিন্তু সিমি গ্রীণ রুম থেকে বেরিয়ে এসে আনিসের সামনে এসে বললো,

'আনিস ভাই, আমি জানতাম আপনি সময় মতো আসতে পারবেন না। তবুও যে এসেছেন, এই জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আবৃত্তি করে ফেলেছি। কিছুক্ষণ পরই অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবে।'

'কিন্তু..!'

'কোন কিন্তু নয়, আপনি যথা সময়ে আসেন নি।'

'হ্যাঁ, আমি তো জানি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যথা সময়ে শুরু হয় না এবং বিলম্বে শেষ হয়। তাই..!'

'আপনার ধারণা অমূলক নয়। কিন্তু আমাদের অনুষ্ঠান যথা সময়েই শুরু হয়েছে।'

আনিস বিব্রতবোধ করতে থাকে। আমি বলি,

'আপনি কি আনিসের জন্য আরেকবার মঞ্চে গিয়ে আবৃত্তি করতে পারবেন?'

আমার কথায় সিমি যেন অবাক হয়।

'আপনাকে তো চিনলাম না!'

'ও আমার বন্ধু। আকাশ।' আনিস আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়।

সিমি বলে,

'আকাশ সাহেব, আমি কোন কমার্শিয়াল শিল্পী নই যে, বললেই মঞ্চে উঠে পারফর্ম করে আসবো।'

সিমি নিজের শিল্পী সত্ত্বার মর্যাদার জানান দেয়। আমি বিনীতভাবে বলি,

‘আমি এ রকম ভেবে বলিনি। আসলে আপনার আবৃত্তি শোনার ইচ্ছে আমারও ছিল। আনিস বলছিলো, আপনি খুব ভালো আবৃত্তি করেন। যাক, আপনার আবৃত্তি শোনার সৌভাগ্য আর হলো না।’

আনিস বললো,

‘আকাশকে ধরে নিয়ে এসেছি তোমার আবৃত্তি শোনার জন্য। ঠিক আছে, অন্য কোনদিন না হয় শোনা যাবে। কী বলিস আকাশ?’

‘হ্যাঁ, ঠিক আছে।’

সিমি যেন খানিকটা লজ্জা পেল। ও বললো,

‘সরি, আমার কথায় রাগ করবেন না। অন্য একদিন আপনাকে আবৃত্তি শোনাবো।’

‘কথা দিচ্ছেন?’

‘দিলাম।’

আনিস বললো,

‘সিমি, আমার বন্ধুটা কিন্তু মেয়েদের মনের তাপমাত্রা বুঝতে পারে না। আর যা-ই করো, ওকে মনের আগুনে পুড়িয়ো না!’

আনিস সিমি আর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগলো। যেন আমাদের মধ্যে একটা লুকোচুরির সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। ওর কথায় আমি খানিকটা বিব্রত হলাম। সিমিও লজ্জা পেল। ও বললো,

‘আনিস ভাই, আপনি যে কী!’

সেদিন সিমিকে আমরা ওদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিলাম। আনিস আমাকে ছাড়েনি। তাই আমাকেও সাথে যেতে হলো। আমি আনিসের পাশের সিটে বসেছিলাম। সিমি বসেছিল গাড়ির পেছনের সিটে। শিশু একাডেমী থেকে মিরপুর

পর্যন্ত যেতে গাড়িতে সিমি কোন কথাই বলেনি। গাড়ি ওদের বাড়ির সামনে আসার পর সিমি বললো,

‘আপনারা বাসায় আসুন।’

‘আজ নয়। আমার একটা জরুরি কাজ আছে।’

আনিসের জবাব।

‘না, তা হয় না। আপনার বন্ধু আকাশ প্রথম এসেছেন..!’

‘ওর জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। অন্য একদিন ওকে নিয়ে আসবো।’

সিমি আমার জানালার সামনে এসে বললো,

‘আরেকদিন কিন্তু আসতে হবে!’

‘আসলে ফিরিয়ে দেবেন নাতো?’

‘না, ফিরিয়ে দেব না। ফোন করে আসবেন।’

‘তাহলে ফোন নম্বর দিন।’

‘লিখুন। ৮০২০০৪৮।’

সিমি চলে গেল। আমরা ওদের বাড়ির গেট থেকে ফিরে এলাম। তখনো ভাবিনি সিমির সাথে আমার আবার দেখা হবে।

২

আমজাদ হোসেন আমার চাচার বন্ধু। তিনি বিআরটিএ-তে চাকরি করেন। সেকশন অফিসার। চাকরির বয়স ফুরিয়ে এসেছে। এ বছরই এলপিআরএ যাবেন। তিনি থাকেন ৬ নং মিরপুরে । চাকুরির জন্য প্রায়ই তাকে ফোন করি। তিনি আমার জন্য চাকুরির চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম মিরপুরে। ফেরার পথে হঠাৎ সিমির কথা মনে পড়ে গেল। সিমিদের বাড়ি ১১ নম্বরে। সিমি বলেছিল

আবৃত্তি শোনাবে। হঠাৎ করে আমার আনিস হতে ইচ্ছে করলো। একটা খেপাটে ইচ্ছে মনে তোলপাড় তোলে। নিজেই অবাক হই নিজের এই পরিবর্তনে। এক অদ্ভুত ও অচেনা তাড়নায় সিমিকে ফোন করি। আমার ফোন পেয়ে সিমি ভীষণ অবাক হয়। ওকে আরো অবাক করে দিয়ে বলি,

'সিমি, আপনি কি আমার সাথে কিছুটা সময় ঘুরে বেড়াবেন?'

'কেন!'

'বিশেষ কোন কারণ নেই। আপনার সাথে ঘুরতে ঘুরতে আপনার আবৃত্তি শুনতে ইচ্ছে করছে।'

'আপনি আমাদের বাসায় এসেও তো অবৃত্তি শুনতে পারেন!'

'আসলে আমার আপনার সাথে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করছে।'

'কিন্তু আমি কেন আপনার সাথে ঘুরতে যাবো!'

'আপনার ইচ্ছে না হলে দরকার নেই। আমি একাই ঘুরবো'।

'আপনি কোথায়?'

'আমি আপনাদের বাড়ির সামনের একটি টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করেছি'।

'কিন্তু?'

'সরি, আমি আপনাকে বিব্রত করে ফেলেছি।'

'আচ্ছা, আপনি অপেক্ষা করুন, আমি আসছি'।

সিমির কণ্ঠে বিরক্তি। এতে খারাপ লাগলো না। অল্প পরিচিত একটি মেয়েকে ঘুরতে বেড়ানোর প্রস্তাব দিলে যে কেউ বিরক্ত হবে। আমি সিমির আসার অপেক্ষা করতে লাগলাম। এবং নিজের ভেতরে নিজের একটা চ্যালেঞ্জ অনুভব করতে লাগলাম। সিমি কী সত্যিই আসবে! যদি আসে, ও কী খুব সেজে আসবে? এই প্রশ্নটি অবান্তর হলেও আমার ভেতরে ঘুরপাক খেতে লাগলো। মেয়েদের সাজ-সজ্জা নিয়ে আমার

তেমন কৌতুহল নেই। কিন্তু এখন কেন জানি মনে হচ্ছে, সিমি সেজে আসলে ভালো লাগবে। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এই স্থান থেকে কিছুটা পথ এগুলে বোটানিক্যাল গার্ডেন। আমার মাথার ওপর হেমন্তের উজ্জ্বল দুপুর। চারপাশ কেমন রোদেলা, ঝকঝকে। হালকা হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষারত অবস্থায় দেখতে লাগলাম, রিকশা বা স্কুটারে চড়ে প্রেমিক যুগলরা যাচ্ছে বোটানিক্যাল গার্ডেনের দিকে। ওদের উচ্ছ্বাস ভরা মুখ দেখে মনটা পরিচ্ছন্ন আকাশের মত হয়ে গেল।

সিমি এলো প্রায় ৩০ মিনিট পর। সাজ-সজ্জার কোন লেশ নেই। ওর গায়ে বিশ্রি কটকটে হলুদ রঙের কামিজ-পায়জামা। খোলা চুল। পায়ে সস্তা স্যান্ডেল। বিরক্তি ভরা মুখ। ওকে দেখে আমি খুব হতাশ হলাম। ও আমার সামনে এসে বললো,

‘এইতো সেদিন মাত্র পরিচয় হলো, আর আজই চলে এসেছেন ঘুরতে! আপনি কী মেয়েদের খেলনা ভাবেন?’

কথা নয়, যেন আগুনের হলকা! আমি কৈফিয়ত দেবার কণ্ঠে বললাম,

‘বিশ্বাস করুন, আমি কখনো কোন মেয়েকে ঘুরে বেড়ানোর প্রস্তাব দিইনি। আজ কী ভেবে, আপনাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছে হলো’।

‘কিন্তু আমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছে হলো কেন? আমাকে প্রেম নিবেদন করবেন নাতো!’

আমি হেসে ফেলি। বললাম,

‘প্রেম-ট্রেমের সস্তা আবেগ আমার মধ্যে নেই। আপনার আপত্তি থাকলে ফিরে যেতে পারেন’।

সেদিন সিমি আমাকে ফিরিয়ে দেয়নি। আমরা বোটানিক্যাল গার্ডেনে ঘুরেছি। আমরা দু’ ঘন্টা ঘুরে বেড়ালাম। এই দু’ ঘন্টায় আমরা যেন খুব কাছাকাছি চলে

এলাম। দু'জনের মধ্যে ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি। দু'জনের কী পছন্দ, কী অপছন্দ এবং আবৃত্তি ও সাহিত্য বিষয়েই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এটুকু আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা একে-অন্যে যেন একটি রেখাপাতের সৃষ্টি করলাম। এরপর থেকে সিমিকে মাঝেমাঝে ফোন করতে লাগলাম। টেলিফোনে আলাপ বেশ ক'দিন চললো। এরপর মুখোমুখি আড্ডা এবং রিকশায় ঘুরে বেড়াতে শুরু করলাম। ঘুরে বেড়ানোটা আমাদের যেন নেশা হয়ে গেল। আমি কোন কেনাকাটা করলে সিমিকে সঙ্গে নিয়ে যাই। সিমি কামিজ তৈরি বা কিছু কিনতে গেলেও আমাকে সাথে নিয়ে যাবে মার্কেটে। আমাদের চলাফেরা এমন পর্যায়ে চলে গেল যে, অবসরে চিন্তায় সিমির কথা ভিড় জমাতে শুরু করলো।

'হ্যালো, আমি কি সিমির সাথে কথা বলতে পারি?'

'অপেক্ষা করুন, ডেকে দিচ্ছি'। অপর প্রান্তে একজন বয়স্ক পুরুষের ভারি কণ্ঠ। সম্ভবত সিমির বাবা। এর আগে যতবার ফোন করেছি সিমির মা ধরেছেন। তিনি খুবই বিনয়ী। সিমিকে ডেকে দিয়েছেন। সিমির বাবা ওকে ডেকে দেবেন কিনা, কে জানে! কণ্ঠ শুনে মনে হচ্ছিলো খানিকটা বিরক্ত হয়েছেন। কোন ছেলে বন্ধুর টেলিফোনের জন্য মেয়েকে ডেকে দিতে যে কোন বাবারই অস্বস্থি লাগতে পারে। আমি টেলিফোন ধরে অপেক্ষা করছি আর ভাবছি। সিমির সাথে আমার শেষ দেখা কবে হয়েছিল, তা মনে নেই। হঠাৎ করেই ওর সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিই। ও অনেকদিন আনিসের কাছে আমার খোঁজ নিয়েছে। আমাকে ফোন করতে বলেছে। আমি ওকে ফোন করিনি। নিজের ভেতর থেকে কে যেন বললো, সংযত হও। ব্যাস, নিজের ভেতরে নিজেরই নির্বাসন।

'হ্যালো, সিমি বলছি..।'

'আকাশ বলছি'।

‘আ-কা-শ!’

‘হ্যাঁ, কেমন আছো?’

‘এতদিন পর খবর নিতে ইচ্ছে হলো! আমি তো ভেবেছি, তুমি আমাকে ভুলেই গেছ!’

‘ভুলে থাকতে চাইলেই কি ভুলে থাকা যায়? আজ তোমার কথা খুব মনে পড়ছে। তুমি কি এখন আসতে পারবে?’

‘কেন, তোমার কি হয়েছে?’

‘কিছু হয়নি তো!’

‘তোমার কণ্ঠ কেমন ভারি লাগছে।’

‘অনেকদিন পর তোমার কণ্ঠ শুনে আবেশিত হয়ে গেছি।’

‘ইডিয়েট!’

‘চলে আসো। আজ সারাদিন ঘুরে বেড়াব’।

‘তুমি কোথায়?’

‘ফার্মগেট ওভারব্রিজে চলো আসো। আমি ওখানে অপেক্ষা করবো’।

‘আমি আসছি’।

ফোন রেখে দিলাম। সিমি আসছে। আমি ওর জন্য ওভারব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

৩

সিমি এলো শাড়ি পড়ে। নীল রঙের জামদানি শাড়ি। ওকে কখনো শাড়ি পড়া অবস্থায় দেখিনি। কপালে নীল টিপ। চুল বাঁধা। সিমিকে আজ অন্যরকম লাগছে।

ওর দিকে তাকিয়ে কেমন মুগ্ধ হয়ে যাই। চোখের পলক পড়তে চায় না। সিমি মিটি মিটি হাসছে। যেন আমাকে অবাক করে দিয়ে ও মজা পাচ্ছে। ও আমার সামনে দাঁড়িয়ে বললো,

‘অমন হা করে কি দেখছো ?’

‘তোমাকে। শাড়িতে তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে!’

‘আমাকে শাড়ি পড়া দেখে খুব অবাক হয়ে গেছ?’

‘অবাক হবার চেয়ে চমকে গেছি খুব।’

‘চমকে গেছ! কেন ?’

‘তোমাকে বউ বউ লাগছে।’ এ কথায় না রেগে গিয়ে সিমি লজ্জা পেয়ে গেল। ও বললো,

‘তা এই বউকে নিয়ে ওভারব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে, না ঘুরতে যাবে ? চারপাশের লোক হা করে দেখছে!’

ও এমন মিষ্টি একটা জবাব দেবে, ভাবিনি।

‘ঠিক আছে, চল।’

আমরা ওভারব্রীজ থেকে নিচে নামার জন্য হাঁটতে লাগলাম। সিমির গা থেকে মিষ্টি একটা গন্ধ আসছে। দু’ জনে পাশাপাশি হাঁটার সময় সিমি আমার বাঁ হাতটি ধরে নিল। আমি বাধা দেই না। আমার ভালো লাগে। ও ঘনিষ্ট হয়ে হাঁটতে থাকলো। ওর গায়ের মিষ্টি গন্ধ আমাকে মাতাল করে তোলে। আমি মুহুর্তেই অদ্ভূত মাদকতায় বুঁদ হয়ে যাই। ফুটপাত ঘেঁষে রাস্তায় থেমে থাকা রিকশাগুলোর সামনে এসে দাঁড়িয়ে একজন বয়স্ক রিকশাওয়ালাকে ইশারায় ডাকলাম। ঘুরে বেড়ানোর জন্য বয়স্ক রিকশাওয়ালা ভালো। কিশোর বা যুবক রিকশাওয়ালারা বেপরোয়াভাবে রিকশা চালায়। বিশেষ করে আরোহী নারী হলে ওদের মধ্যে এক ধরনের হিরুইজম ভাব

কাজ করে। ওরা জোর গতিতে রিকশা চলাতে চেষ্টা করে। রাস্তার খানাখন্দ দেখে পথ চলে না। এ ছাড়া ওরা আরোহীদের কথাপোকথন শোনার জন্য উদগ্রীব থাকে। ফলে দূর্ঘটনার আশংকা থাকে। কিন্তু বয়স্ক রিকশাওয়ালারা ধীরে রিকশা চালায়। আরোহীদের কাথাবার্তায় বিশেষ মনযোগ দেয় না। আমাদের রিকশায় চড়ে সময় কাটানোটাই মুখ্য। তাই সবসময় বয়স্ক রিকশাওয়ালা আমি খুঁজি। একজন বয়স্ক রিকশাওয়ালা রিকশা নিয়ে কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো,

'কোথায় যাবেন, স্যার ?

'ঘন্টাচুক্তি যাবে ? যেখানে ইচ্ছে ঘুরবো।'

'২৫ টাকা ঘন্টা, স্যার।'

'ঠিক আছে। সাবধানে চালাবে।'

আমরা দু' জনে রিকশায় উঠে বসলাম। রিকশা চলতে শুরু করলাম। রিকশাচালক বয়স্ক হলেও রিকশা চালাচ্ছে একটু বেশি গতিতে। এতে ঝাকুনি লাগছে। সিমি বসেছে আমার বাঁ পাশে। রিকশার ঝাকুনি সামাল নিতে সিমি ওর ডান হাত দিয়ে আমার বাঁ হাত শক্ত করে ধরে রাখলো। ও আমার হাত ধরতেই পারে। কিন্তু আজ আমার ভেতরে কেমন ভাঙন হতে লাগলো। আড়ষ্টতা আর আবিষ্টতা আমাকে গ্রাস করলো।

'কী ব্যাপার, তুমি এমন কাঠ হয়ে আছো কেন ?'

'কই, নাতো!'

'আগে রিকশায় ঘুরে বেড়ানোর সময় তুমি কত কথা বলতে! আজ কেমন চুপসে আছো! এক বছরে তোমার এমন বদল!'

'আমার আবার বদল! এক বছর পর তোমাকে দেখলাম। তোমাকে কী সুন্দর লাগছে আজ! তাই ভাবের আবেগে ভাষামূক হয়ে গেছি।'

‘তাই নাকি!’
‘জ্বি, ম্যাডাম।’
‘তাহলে তো সত্যিই বদলেছো। তোমাকে তো কখনো মুগ্ধ হতে দেখিনি!’
‘আমাকে মুগ্ধ করার চেষ্টাও তো করোনি।’
‘তোমাকে মুগ্ধ করার আমার কী দায় পড়েছে ?’
‘আজ কি আমার জন্য সেজে আসো নি ? এটা কি দায় নয়?’
‘কোন দায় থেকে সেজে আসিনি, স্মার্ট রমণীর দায়িত্ব থেকে সেজেছি।’
‘তবে এ আমার ভ্রান্তিবিলাস!’
‘জ্বি, জনাব। এবার বলো এতোদিন কোথায় ছিলে?’
‘এই শহরেই।’
‘আমার সাথে যোগাযোগ রাখোনি কেন?’
‘ব্যস্ত ছিলাম।’
এ কথায় গম্ভীর কণ্ঠে সিমি বললো,
‘তোমার এড়িয়ে চলা বুঝতে পারি, আকাশ। শুধু জানি না, কেন আমাকে এড়িয়ে চলো। আমি অনেকবার আনিস ভাইকে বলেছি, তুমি যেন আমাকে ফোন করো। তুমি কোথায় থাকো তার ঠিকানাও আমাকে দাও নি। নিশ্চয়ই, আনিস ভাই তোমাকে আমার বার্তা পৌঁছে দিয়েছে? সাধারণ সৌজন্যবোধ থাকলে, একটা ফোন করতে।’
ও হরহর করে কথাগুলো বলে গেল।
‘সিমি। আমি আসলে..’
‘আমি জানি, তুমি এর জবাব তৈরি করে রেখেছো। তোমার সাথে আমি কথায় পারবো না। আমি শুধু জানতে চাই, তোমার এতো অহংকার কেন ?’

‘তুমিও আমাকে এই প্রশ্ন করলে ?’
‘খুব কি কঠিন বা অবান্তর প্রশ্ন ?’
‘কঠিন নয়, তবে বোঝার ভুল।’
‘কী রকম!’
‘আমি নিজেকে সংযত রাখতে পছন্দ করি।’
‘যেমন !’
‘আহ্! এতদিন পর দেখা হলো, আর তুমি কেবল জেরাই করে যাচ্ছো। এখন বলো, তুমি কেমন আছো?’
‘ভালো আছি।’
‘গত এক বছর কীভাবে কাটালে?’
‘গত এক বছরে আমার অনেক অভিজ্ঞতা বেড়েছে। অনেক ধরনের লোকের সাথে পরিচয় হয়েছে। মানুষের চরিত্র কত ফানি!’
‘কার কথা বলছো ?’
‘নির্দিষ্ট কারো কথা বলতে চাইছি না। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়ন ও আবৃত্তি চর্চা করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত কত রকম লোকের সাথে পরিচয় হয়েছে এবং হচ্ছে। লক্ষ্য করে দেখলাম, একেক মানুষ একেক রকম! বিশেষ করে পুরুষগুলোর চরিত্র বড় বিচিত্র!’
‘তুমি কি পুরুষ বিদ্বেষী হয়ে গেলে নাকি ?’
‘হতেও পারি। তোমরা পুরুষরা কেবল দখল করতে চাও। জয় করতে চায় না।’
‘তাই নাকি! তোমাকে দখল করতে কে চায়?’
‘অনেক জনের নাম বলতে পারি। সবাইকে তুমি চিনো না। তোমার পরিচয়ের মধ্যে একজন আছে।’

‘আমার কৌতুহল বাড়ছে। কে সে?’

‘বলবো না।’

‘কেন ?’

‘কারণ, তোমাকে বলে লাভ নেই। তুমি আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না।’

‘এটা তোমার বিশ্বাস?’

‘হুম্।’

আমি চুপসে যাই। আমার ভেতরে এক ধরনের বিব্রতবোধ পেখম ছড়িয়ে নেয়। সিমি কি সত্যি কথাটিই বললো ? আমি কি ভরসা করার লোক নই ?

‘তুমি কি রাগ করলে?’

‘নাহ্।’

‘তুমি কি সত্যিই শুনতে চাও, কে আমাকে বিয়ে করতে চায়?’

‘বিয়ে?’

‘হ্যাঁ, বিয়ে।’

‘বিয়ে কি দখল করা?’

‘হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়। ধরো, একজনকে আমি চিনি না, কিংবা চিনি, কিন্তু আমাদের মধ্যে কোন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নেই। সেই ব্যক্তি যদি আমাকে বিয়ে করে, তা আমাকে দখল করা নয়?’

‘তুমি নিজেকে মানুষ এবং সামাজিক জীব ভাবলে তোমাকে সমাজের নিয়ম মেনে চলতে হবে। তুমি তোমার পরিবারের প্রতিও দায়বদ্ধ। তাছাড়া ক’জন বলো ভালোবেসে বিয়ে করতে পারে ? পারিবারিক পর্যায়ে আমাদের সমাজে বিয়ে হচ্ছে। এটা চলে আসছে শত শত বছর ধরে। সামাজিক বিয়ের ভিত্তি ঠুনকো হলে তা এতোদিন টিকতো না। এই বিয়েকে তুমি নেগেটিভভাবে দেখছো কেন ?

ভালোবাসার বিয়েও যে খুব মধুর হবে, তার গ্যারান্টি কি? আসলে, তোমাকে দেখতে হবে, তুমি যাকে বিয়ে করবে, সে তোমার যোগ্য কিনা। সে তোমাকে যথাযথ সম্মান ও অধিকার দেবার লোক কিনা। তার মানসিক গঠন, রুচি, স্বভাব, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি তোমার চাহিদা মত আছে কিনা। তুমি যদি আরো খুঁটিয়ে দেখতে চাও, দেখতে পারো তার সন্দেহ প্রবণতা, ঝগড়াটে মানসিকতা আছে কিনা এবং সে অসংস্কৃতিবান কিনা। পরিচিত বা অপরিচিত ব্যক্তি হলেও এই গুণাবলী থাকলে তুমি বিয়ে করতে পারো।'

'বাহ্, চমৎকার ব্যাখ্যা!'

'খুব কি ভুল বললাম ?'

'মনে হয় না। তোমার কথা গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে।'

'যাক মনে হচ্ছে, অচিরেই তোমার বিয়ের দাওয়াত পাবো।'

বলেই আমি খিলখিলিয়ে হেসে উঠলাম। সিমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভারি কণ্ঠে বললো,

'আকাশ, আজ তোমাকে একটা প্রশ্ন করবো ?'

'করো।'

'তোমার সাথে আমার সম্পর্কটা কি? অন্তত তুমি কীভাবে দেখ?'

আমার ভেতরে কে যেন হাতুরি পেটাতে শুরু করে। নিজের স্পন্দনের শব্দ শুনতে পাই। এমন তো হওয়ার কথা নয়! আমি নিজেকে সংযত করে বলি,

'বিষণ্ন পথিকের সাথে বৃষ্টির যে রকম সম্পর্ক, তোমার আমার সম্পর্কটাও সেরকম।'

'মানে!'

‘আমার যখন খুব মন খারাপ হয়, তখন আমি বৃষ্টিপাতের কামনা করি। বৃষ্টি হলে আমি আপ্লুত হই। বৃষ্টিতে ভিজতে আমার ভালো লাগে। মনে হয়, আমার মাথার ওপর বৃষ্টি আর ভেতরের বৃষ্টি একাকার। তুমি আমার কাছে বৃষ্টির মত প্রিয়।’

‘তুমি কি জান, বৃষ্টি ধরা যায়। কিন্তু ধরে রাখা যায় না!’

‘বৃষ্টি তো ফুরিয়ে বা হারিয়েও যায় না।’

‘তোমার সাথে কথায় পারবো না। স্পষ্ট করে বলার সাহস তোমার নেই?’

‘যখন সাহস হয়, তখন সময় অনকূলে থাকে না। সময় হলে সাহস থাকে না। সময় ও সাহস যখন হয়, তখন তুমি পাশে থাকো না। হা-হা-হা..।

‘তোমার উপেক্ষা সহ্য করতে পারি। কিন্তু মাঝেমাঝে আমারও এর শোধ নিতে ইচ্ছে করে।’

‘শোধ নয়, রোধ করো আবেগের বহ্নিশিখা। নইলে এ আগুনে পুড়ে ছাড়খার হবে।’

‘অভিশাপ দিচ্ছো ?’

‘না, সাজেশন দিচ্ছি। তা বললে না, আমার পরিচিত কে তোমাকে বিয়ে করতে চায়?’

‘তোমার বন্ধু আনিস।’

‘আ-নি-স!’

‘হ্যাঁ, আনিস ভাই। তিনি গত সপ্তাহে আমার বাবা-মার কাছে আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছেন।’

‘কিন্তু...!’

‘আমি জানি, আমার বড় বোন রিমির সাথে তার প্রেম ছিল। রিমি তার প্রতি ভীষণ দুর্বল ছিল। আনিস ভাই কিন্তু রিমিকে বিয়ে করেনি।’

‘হ্যাঁ..!’

'রিমি আনিস ভাইয়ের ওপর রাগ করে বিয়ে করে ফেলে। কিন্তু আমি জানি, আনিস ভাইকে ভুলতে পারে নি রিমি। সেই রিমির ছোট বোনকে তিনি বিয়ে করে হয়তো তার পুরানো প্রেমের সম্পর্কটা জিইয়ে রাখতে চান।'

'রিমি কি এই প্রস্তাবের কথা জানে?'

'হ্যাঁ, আমি ফোন করে ওকে এ খবর জানিয়েছি। ও কিছু বলেনি। আমাদের বাড়িতে এই বিয়ের প্রস্তাব লুফে নিয়েছে।'

আমি কিছু বলতে পারি না। চুপসে যাই। একরাশ অস্বস্তি ছড়িয়ে পড়ে চিন্তার মধ্যে। মন খারাপ হয়ে যায়। কিছু বলার ভাষা খুঁজে পাই না। সিমিও চুপ। সোবহানবাগের রাস্তা দিয়ে নিউমার্কেটের দিকে রিকশা চলছে। এ রাস্তা দিয়ে আমরা অনেক দিন রিকশায় ঘুরে বেড়িয়েছি। এখানকার চারপাশ আমার খুবই পরিচিত। কিন্তু চারপাশের চেনা দৃশ্যগুলো আজ কেমন অচেনা লাগছে। সিমির শরীরটা যেন কাঁপছে। ও কি কাঁদছে? সিমির চাপা কান্নার সামনে নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হতে লাগলো। এখন যদি ঝমঝম করে বৃষ্টি হতো, ভালো লাগতো। কিন্তু আকাশে মেঘ নেই। মেঘ শুধু মনের আকাশে।

৪

আমার ছাত্রী তিতলির বয়স নয় বছর। ও ভিকারুনিসা নুন স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। ও ভীষণ চটপটে। মাঝেমাঝে ও অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসে। আজ ওকে ঐকিক নিয়মে একটি অংক শিখাচ্ছিলাম। অংক করার সময় ও হঠাৎ প্রশ্ন করলো,

'স্যার, হরতাল কি ?'

'হরতাল হচ্ছে ধর্মঘট।'

'হরতাল কারা করে?'

‘যারা রাজনীতি করেন।’
‘কেন করে?’
‘দাবি আদায়ের জন্য। তুমি এখন অংক কর।’
‘স্যার, হরতাল আমার ভালো লাগে।’
‘কেন?’
‘হরতাল হলে স্কুলে যেতে হয় না। আচ্ছা, প্রতিদিন হরতাল হলে কেমন হবে?’
‘হরতাল ভালো নয়। হরতাল হলে দিনমজুর, শ্রমিকদের উপার্জন বন্ধ হয়ে যায়। ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্থ হন। পুরো দেশের মানুষের ক্ষতি হয়। তোমার স্কুল বন্ধ থাকলে লেখাপড়া শিখতে পারবে না।’
‘তাহলে ওরা হরতাল দেয় কেন?’
‘ওরা নিজেদের স্বার্থের জন্য হরতাল দেয়। এখন তুমি অংকটা শেষ কর।’
‘আচ্ছা।’
অনেক সময় তিতলির প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু আমি জানি, দরোজার ওপাশে তিতলির মা অর্থাৎ তামান্না হোসাইন দাঁড়িয়ে আছেন। তার অদ্ভুত স্বভাব। তিতলি যতক্ষণ আমার কাছে পড়বেন, ততক্ষণ তিনি দরোজার ওপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবেন। টিচারের টিচিং এভাবে কড়া নজর কেউ রাখে বলে আমি জানি না বা কখনো শুনিনি। প্রথম দিনেই তিতলির মার এই স্বভাবের কথা জানতে পারি। সেদিন তিতলিকে পড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ তিতলি ফিক করে হেসে বললো,
‘স্যার, আপনার শার্টের একটি বুতাম নেই। হি হি হি।’
ওর হাসিতে বিব্রত হয়ে পড়ি। দেখি, সত্যিই শার্টের পেটের দিকে একটি বুতাম নেই। হয়তো রাস্তায় খুলে পড়ে গেছে। আমি টেনেটুনে শার্ট ঠিক করে ধমকের সুরে তিতলিকে বলি,

‘তিতলি, শিক্ষকের সাথে এমন করতে নেই!’
ভেতর থেকে এ কথার তাৎক্ষণিক জবাব দিলেন তামান্না হোসাইন।
‘টিচার, বাচ্চাদের অবান্তর প্রশ্নে রাগ করবেন না।’
‘না, না, আমি রাগ করিনি।’
এ ঘটনায় আমি অবাক হয়ে যাই। পরেরদিন তিতলির মা আমাকে আরো অবাক করে দেন। তিতলিকে পড়িয়ে ফেরার সময় তামান্না হোসাইন আমার সামনে এলেন। আমি চা পান করছিলাম। তিনি আমাকে একটি প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বললেন,
‘আপনার জন্য একটি শার্ট কিনেছি। এই শার্টটি নিয়ে গেলে আমি খুব খুশি হবো।’
আমি কি বলবো ভেবে পাই না। তিনি বলেন,
‘আমার কথায় কিছু মনে করবেন না।’
‘না, কিন্তু..!’
‘কোন কিন্তু নয়, দেখুন তিতলি আপনাকে খুব পছন্দ করেছে। এটি আমাদের পক্ষ থেকে উপহার হিসাবে ধরে নেবেন।’
এরপর থেকে বিভিন্ন সময়ে আমি উপহার পেতে থাকলাম। তিতলির বাবা আফজাল হোসাইন কাষ্টমস বিভাগের বড় কর্মকর্তা। তার অনেক অর্থ-বিত্ত। তিতলি তাদের আদরের একমাত্র সন্তান। তিতলিকে ওর মা যেন চোখের আড়াল করতে চান না। পড়ার টেবিলেও তার দৃষ্টি। তিতলির পড়া শেষ হলে আমার জন্য মুখরোচক খাবার চলে আসে প্রতিদিন। কিছু না খেলে তিতলির মা অনুরোধ জানাবেন ‘না খেয়ে যেন না যাই’। ভদ্রমহিলার দৃষ্টি যেন সর্বত্র বিরাজমান। এই টিউশনিটা আমার ভালো লেগে যায়। বেতনও ভালো। মাস শেষ হলেই চার হাজার টাকা। আর আছে অপ্যায়ন ও উপহারের উপদ্রব। গত পাঁচ মাস যাবত টিউশনিটা করছি। এই

টিউশুনিটা যুগিয়ে দিয়েছিল আমার কবি বন্ধু আরিফ। তামান্না হোসাইন আরিফের ফুপু। আরিফের জন্যই এমন ভালো বেতনের টিউশনিটা পেয়ে যাই। টিউশুনির পর বাকীটা সময় চাকরি খুঁজি। চাকরি না পাওয়ার হতাশা দিনে দিনে জমাট বাঁধলেও টিউশনিটা আমাকে ঢাকার নাগরিক জীবনে টিকে থাকতে সাহায্য করছে।

'স্যার, অংকটা হয়ে গেছে।'

তিতলি সব কিছু সহজেই ধরতে পারে। ও খুব মেধাবী। ওকে পড়াতে আমিও আনন্দ পাই।

'ঠিক আছে, আজ এই পর্যন্তই।'

'আচ্ছা।' বলেই তিতলি দ্রুত ওর বই-খাতা গুছিয়ে নেয়। তিতলিদের কাজের বুয়া আমার সামনে নুডুলস ও রসমালাই রাখলো। খাবারের আয়োজন প্রতিদিন তৈরি থাকে। তিতলি বই গুছানোর সময় খাবার চলে আসে। না খেয়ে যাওয়া যাবে না। তামান্না হোসাইনের চোখ সতর্ক। আমি নিঃসংকোচে রসমালাই খেতে থাকি। তিতলি বই গুছিয়ে চলে যায়। খাবার শেষ করে উঠতে যাবার সময় তামান্না হোসাইনের গলার স্বর ভেসে এলো,

'আপনি একটু বসুন, আমি আসছি।'

আমি চুপচাপ তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনি এলেন। তামান্না হোসাইনের দিকে আমি কখনো সরাসরি তাকাইনি। আজ এক ঝলক দেখলাম। ভদ্রমহিলার বয়স ৩৫/৩৬ বছর হবে। সুন্দরী। সেনা কর্মকর্তা ও কাস্টমস কর্মকর্তাদের স্ত্রী সাধারণত অপূর্ব সুন্দরী হয়। তামান্না হোসাইনও অপূর্ব সুন্দরীদের একজন। তিনি স্মার্টও। তিনি আমার সামনের চেয়ারে বসলেন।

'আপনি সব সময় মাথা নিচু করে থাকেন কেন? আপনি কি খুব লাজুক?'

'জ্বি, না।'

‘ঠিক আছে, এখন বলুন তো আপনার কে কে আছে? এই যেমন ধরুন মা-বাবা ভাই-বোন।’

‘কেন?’

‘এমনিই, জানতে ইচ্ছে করছে। বলতে অসুবিধা আছে? আরিফ বলেছিল, আপনার আপনজন বলতে কেউ নেই।’

‘আমার মা-বাবা বেঁচে নেই। ভাই-বোন বলতে কেউ নেই। নিকট আত্মীয়-স্বজন আছেন, তাদের সাথে এখন যোগযোগ নেই। আমার চাচা গ্রামের স্কুল শিক্ষক। তিনি আমাকে লালন পালন করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন। তিনিও এখন বেঁচে নেই।’

‘আপনি কোথায় এবং কার কাছে থাকেন?’

‘থাকি মগবাজারে, একটি মেসে।’

‘মেসে!’

‘মেস বলতে একটি চারতলা বাড়ির ছাদের চিলেকোঠায় একরুমের বাসা। আমরা দু’ বন্ধু থাকি। বাসাটা ভালোই।’

‘চাকরির চেষ্টা করছেন?’

‘হ্যাঁ, খুব চেষ্টা করছি।’

‘আপনি ইকোনিমিক্সে মাস্টার্স করেছেন না?’

‘হ্যাঁ।’

‘বিসিএস দিচ্ছেন না কেন?’

‘দু’ বার দিয়েছি। রিটেনে ভালোই করি। কিন্তু ভাইবাতে আটকে যাই। আসলে, ঘুষের জন্য ভাইবার মার্কর্স বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। তাই ও পথে এগুবার ইচ্ছা ত্যাগ করেছি।’

‘ঠিক আছে, আমি আপনার জন্য কিছু একটা করার চেষ্টা করবো।’
‘কিন্তু আপনি আমার জন্য কেন কিছু করতে চাচ্ছেন?’
‘ধরুন, আপনার কেউ নেই বলে।’
এই কথায় আমি কিছু বলতে পারি না। আমার প্রতি তার এক ধরনের স্নেহের প্রকাশ সব সময় দেখতে পাচ্ছি। ৬ বছর বয়সে মা এবং ১৪ বছর বয়সে বাবাকে আমি হারিয়েছি। বাবা-মায়ের স্নেহে-ভালোবাসা শিশু বয়সে হারালেও মানুষের ভালোবাসা অনেক পেয়েছি। অসহায়-এতিম বলে আমাকে আমার বন্ধুর মা-বাবা খুবই স্নেহ করতেন। আমার জন্য অনেক বন্ধুর মা দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন। আমি মাতৃত্বের স্নেহ খুব সহজেই ধরতে পারি। তামান্না হোসাইনের স্নেহও সেরকম। আমার চোখ ভিজে আসতে চায়। আমি সামলে নেই।
‘ঠিক আছে, আজ আসি।’
‘আসুন।’
আমি দ্রুত বেরিয়ে আসি তিতলিদের অ্যাপার্টম্যান্ট থেকে।

৫

আমার ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে হিরণ ছাত্র রাজনীতিতে সম্পৃক্ত। ছাত্র রাজনীতির জন্য হিরণ এখনো ছাত্রত্ব ছাড়ে নি। ও ইকোনোমিক্সে মাস্টার্স করার পরও লাইব্রেরী সাইন্সে ফের ভর্তি হয়েছে। থাকছে হলে। নিয়ন্ত্রণ করছে একটি রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন। রাজনীতি ওর ধ্যান-জ্ঞান। ওর ধারনা রাজনীতিই সমাজ বদলের একমাত্র হাতিয়ার। দেশ পরিচালনার নেতৃত্ব দিতে রাজনীতিবিদদের বিকল্প নেই। রাজনৈতিক সচেতন না হলে সুশীল সমাজ গঠন করা সম্ভব নয়। রাজনীতি নিয়ে হিরণের আরো অনেক কথা। ওর এ সব কথার তীব্র প্রতিবাদ করে আরিফ। হিরণও

আরিফের কাব্যচর্চার নিন্দায় মুখিয়ে থাকে। আরিফের কবিতা লেখার বাতিক। যেখানে কবিতানুষ্ঠান, সেখানেই আরিফ। ও প্রতিদিন কবিতা লিখে যাচ্ছে। ও এতো কবিতা কীভাবে লিখে, কে জানে! দেখা হলেই ওর কবিতা শুনতে হয়। আজ টিএসসিতে জাতীয় কবিতা পরিষদের কবিতা উৎসব। আরিফ এই উৎসবে কবিতা পাঠ করবে। আমি ও আনিস এসেছি আরিফের কবিতা শুনতে। টিএসসিতে হিরণের সাথে দেখা হয়ে গেল। জমে গেল চার বন্ধুর আড্ডা। আমাদের পেয়ে হিরণ রাজনৈতিক ভাষণ শুরু করে দেয়। আরিফ ওর বক্তব্যের বিরোধীতা করতে থাকে। ওরা দু' জন এক সাথে হলে ওদের তর্ক যুদ্ধ থামাতে হিমসিম খেতে হয় আমাদের। টিএসসি সড়ক দ্বীপ মোহনায় কবিতা উৎসবের মঞ্চ। এই উৎসবের কারণে টিএসসি আজ কবিদের পদচারণায় মুখর। গ্রামের স্বভাব কবি থেকে উত্তর আধুনিক কবি, সবাই এই উৎসবে সমবেত। আরিফের মধ্যে এক ধরনের উত্তেজনা। এমন একটি অভিভূতপূর্ণ সময় বন্ধুরা মিস করুক, আরিফ তা চায় নি। আরিফের অনুরোধ ফেলতে পারি নি আমি ও আনিস। আমরা এখন বসে আছি ফুটপাতের চায়ের স্টলে। মাথার ওপর গনগনে দুপুর। কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান চলছে। মাইকে কবিতা পাঠ হচ্ছে। চা পান করতে করতে হিরণ বললো, দেশে যে হারে কবিদের সংখ্যা বাড়ছে, তাতে কবিদের জন্ম নিয়ন্ত্রণের ওষুধ আবিস্কার করতে হবে বিজ্ঞানীদের।'
এই বিদ্রুপে খেপে গেল আরিফ।
'কবিতা আছে বলেই এখনো মানুষের মনে সুকুমার বৃত্তির চর্চা আছে। তোরা রাজনীতিবিদরা তো এখন সন্ত্রাসীদের সংখ্যা বাড়াচ্ছিস।'
'দেখ, রাজনীতিবিদরা হচ্ছে দেশের কান্ডারি। দেশের ক্রান্তিকালে তারাই পথ দেখান, ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন!'

‘তোদের অনেকগুলো মুখোশ পড়ে থাকতে হয়। মঞ্চে মায়াকান্নার মুখোশ। কর্মীদের সামনে এক মুখোশ, গোপন সমঝোতায় আরেক মুখোশ। এমনকি, বাড়িতেও আরেক রকম মুখোশ পড়ে থ্যাকিস, তা আমরা জানি।’

‘আরিফ-হিরণ আজকে তোরা ঝগড়া করিস নে বাপ। এসেছি আরিফের কবিতা শুনতে। আজকের দিনটি আরিফের। তাই না আকাশ?’

আনিসের এই প্রস্তাবে আমিও মাথা নেড়ে সায় দেই। চুপসে যায় হিরণ। আমরা টিএসসি’র গোল চত্বরের বাইরে ফুটপাতে মোখলেস মিয়ার চায়ের স্টলের টুলে বসে চা পান করছিলাম। মোখলেস মিয়ার চায়ের স্টলে অনেকদিন আড্ডা দিয়েছি। মোখলেস মিয়া আমাদের দেখে খুশি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরানো ছাত্রদের দেখলে শিক্ষক যেমন খুশি হন, মোখলেস মিয়ার খুশিও সেরকম। তার আন্তরিকতা আমাদেরও ভালো লাগে। আজ দুপুরে আরিফ আমাদের খাওয়াবে। কবিতা শুনার কাকফারা। আনিস বললো,

‘আমি কিন্তু মেঘলাকে আসতে বলেছি টিএসসিতে। অনেক দিন হলো ওর সাথে যোগাযোগ নেই। আজ ওর অভিমান ভাঙ্গাবো। কাল রাতে মেঘলাদের বাসায় ফোন করেছিলাম। প্রথমে তো কত বাহানা, অভিযোগ! পরে গলে জল হয়ে গেল।’

‘আমাদের ডিপার্টম্যান্টে পড়তো, সেই মেঘলা!’ আরিফের প্রশ্ন।

‘হ্যাঁ, যাকে তুই কবিতা কখনো শুনাতে পারিস নি, সেই মেঘলা।’

‘মেঘলা আরিফের কাব্য প্রতিভার মূল্যায়ন করতে পেরেছিল। হা হা হা।’

হিরণ খিলখিলিয়ে হেসে উঠে।

‘মেঘলা রাজনীতিবিদদেরও পছন্দ করে না। ওর পছন্দ নতুন মডেলের গাড়ি এবং গাড়ির মালিক।’

আরিফের জবাব। সিমিকে বিয়ে করার প্রস্তাবের কথাটি আমি আনিসকে জিজ্ঞেস করি নি। আনিসও আমাকে কিছু বলেনি। আনিসের সাথে দেখা হবার পর থেকে আমার ভেতরে অস্বস্তি টের পাই। কিন্তু কৌতুহল চেপে রাখি। আনিসের এ কথায় আমি বলি,

'শুনলাম, তুই সিমিকে বিয়ে করতে যাচ্ছিস। এখন আবার মেঘলার সাথে যোগাযোগ কেন?'

'তাই নাকি!' আরিফ ও হিরণের বিস্ময়।

'দোস্ত, বউ আর বান্ধবী এক কথা নয়। সিমি হবে বউ, আর মেঘলা বান্ধবী। সহজ সমীকরণ। মেঘলা কখনো বউ হবার মতো মেয়ে নয়। সিমি শান্ত দিঘির মতো। ঘরে ফিরে শান্ত দিঘিতে সাঁতার কাটতে চাই। উত্তাল সমুদ্র চাই না।' জবাব দিল আনিস।

'তা বেশ। তোরা বিত্তবানরা সব কিছু নিজের মতো করে সাজিয়ে নিতে পারিস। সম্পর্কের নামও দিতে পারিস। তোদের স্বপ্নের পরিধি আমাদের চেয়ে অনেক বড়।'

'তুই কি আশাহত হলি, নাকি আমাকে আঘাত করতে চাচ্ছিস?'

'তোর আর আমার জীবন-যাপনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটা দেখতে চেষ্টা করছি।'

'রাখ তো তর্ক! আনিস, তুই কি সত্যিই সিমিকে বিয়ে করছিস!' আরিফের প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, সম্ভবত খুব শিঘ্রি সিমিকে বিয়ে করবো। যদি আকাশের আপত্তি না থাকে..।'

'আমার আপত্তি থাকবে কেন? আপত্তি থাকলেও তোর সাথে প্রতিযোগিতায় আমি কখনো পারবো ?'

'তুই চাইলে, আমি নিজেই সরে দাঁড়াতে পারি। আফটার অল, তুই আমার বন্ধু। তাছাড়া সিমিকে তুই বিয়ে করলে আমার আপত্তি নেই।'

'তুই কি বন্ধু হিসাবে আমাকে করুনা করতে চাচ্ছিস?'

‘করুণা কিনা জানি না, তবে তুই যদি ওকে বিয়ে করতে চাস, আমি আজই বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে নেব।’

‘আনিস, আমার স্বপ্ন আর বাস্তবতার মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। সিমিকে নিয়ে আমি ভাবি না বা ভাবতে চাইও না।’

‘সিমিকে নিয়ে তুই স্বপ্ন দেখিস না!’

‘ও আমার কাছে স্বপ্নের চেয়েও দূরবর্তী কিছু। ও আমার স্বপ্ন বিলাস’

‘যাক বাবা, বাঁচালি। আমি এখন নিশ্চিন্তে সিমিকে বিয়ে করতে পারি। কি বলিস?’

‘হ্যাঁ।’

আরিফ প্রশ্ন করে আমাকে,

‘সিমি আর তোর মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক নেই?’

‘আমরা বন্ধুর মতই ঘুরে বেড়িয়েছি। আমরা দু’জন দু’জনকে পছন্দ করি ঠিক, ভালোবাসাবাসির কথা কখনো হয় নি। তোরা তো জানিস, আবেগের ব্যাপারে আমি কতটা নিরুৎসাহিত।’

হিরণ কিছু বলতে যাচ্ছিলো, ও মেঘলাকে দেখে থেমে গেল। মেঘলা রিকশা থেকে নেমেই বললো,

‘বাহ্, বহুদিন পর চার বন্ধুকে একসাথে দেখছি!’

মেঘলা পড়েছে জিন্স প্যান্ট আর টি শার্ট। সানগ্লাসটা বুকের ওপর টি শার্টের বোতামে আটকে ঝুলছে। ও এসে বসলো আনিসের পাশে। মিষ্টি পারফিউমের মৌ মৌ গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো।

‘আমি মঞ্চের দিকে যাচ্ছি, এখুনি আমার নাম ডাকা হবে।’ বলেই আরিফ উঠে চলে গেল। মেঘলা বাঁকা চোখে আরিফের চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইলো। হিরণ বললো,

‘তোরা গল্প কর, আমি একটু মধুর ক্যান্টিন ঘুরে আসছি।’

আনিস আমাকে বললো,

‘তুই মঞ্চের সামনে যেয়ে আরিফের কবিতা শোন। আমি মেঘলাকে নিয়ে ঘুরে আসি।’

কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাদের আড্ডা ভেঙ্গে গেল। আনিস ও মেঘলা হেঁটে চলে গেল রাস্তার ওপাশে। আনিস ওর গাড়িতে চড়লো। মেঘলা বসলো ওর পাশের সীটে। আমার বিষণ্ন দৃষ্টির সীমারেখা থেকে আনিসের নিশান জীপটি ধূলি উড়ানোর অহংকারে চলে গেল দ্রুত।

৬

মিতাকে আমার মনে রাখার কথা নয়। মিতাও আমাকে মনে রাখবে, এমন সম্পর্ক আমাদের নয়। কলেজের অনেক সহপাঠীদের মতো মিতাও ছিল আমার ক্লাসমেট। ও ছিল খুবই লাজুক প্রকৃতির। মফস্বল শহরের নিু মধ্যবিত্ত ঘরের পর্দাসীন মেয়েরা কলেজে এসে খোলামেলা পরিবেশে কখনো বিব্রত হয়, কখনো অজানা ভালো লাগায় বুঁদ হয়ে যায়। ঘরের শাসনের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে ব্যক্তি স্বাধীনতার স্বাদ পেয়ে তারা চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু মিতা ছিল শান্ত ও লাজুক। ক্লাসে আমি বসতাম পিছনের বেঞ্চে। মিতাও বেশির ভাগ সময় পিছনের বেঞ্চে বসতো। নিজেকে গুটিয়ে রাখার আভ্যাসের কারণে আমার পিছনে বসতো ভালো লাগতো। মিতা হয়তো লাজুক স্বভাবের কারণে পিছনে বসে স্বস্থি বোধ করতো। পিছনে বসার নিয়মিত ছাত্র হিসাবে এক পার্যায়ে মিতার সাথে আলাপ-পরিচয় হয়। দিনে দিনে ওর সাথে সম্পর্কটা বন্ধুত্বের দিকে মোড় নেয়। মিতার ব্যক্তিগত বা পাারিবারিক

ব্যাপারে আমার কৌতুহল ছিল না। মিতাও আমার জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে কখনো জানতে চায় নি। আমাদের আলোচনা পড়ার বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল বেশি। তবে সিনেমা হলে গিয়ে একবার দু' জনে একটি ছবি দেখেছিলাম। এটা ছিল আমার কোন মেয়েকে নিয়ে সিনেমা হলে গিয়ে প্রথম ছবি দেখা। শেষ ছবিও বলা যায়। কারণ, এ পর্যন্ত আমি আর কোন মেয়ের সাথে ছবি দেখিনি। এই সিনেমা দেখার ঘটনাটি বাদ দিলে মিতাকে মনে রাখার মতো কোন অর্থপূর্ণ বা উজ্জ্বল ঘটনা আমার স্মৃতিতে নেই।

মিতা ছিল আমাদের ক্লাসের অসম্ভব সুন্দরী ছাত্রী। ওর গায়ের রঙ দুধে-আলতা। চোখ দুটি বড় মায়াবী। এক কথায় ওর ছিল চোখ ধাঁধানো রূপ। কলেজের সিনিয়র ছাত্র ও একাধিক ছাত্রনেতা মিতাকে দেখলে যেচে কথা বলতো। কলেজ চত্বরে ওকে দেখলে রোমিওরা কেমন বিনয়ীকণ্ঠে ওর কুশল জিজ্ঞেস করতো। ওর জন্য অনেকে আমাকেও অযাচিত খাতির করতো। কলেজ ছাত্র-সংসদের জিএস ফখরুল ওকে একবার একগুচ্ছ ফুল পাঠিয়েছিল। মিতা ওই ফুল ফিরিয়ে দিতে পারেনি, ভয়ে। আবার গ্রহণও করতে পারে নি। সেদিন সেই ফুল সবার অলক্ষে আমি কলেজের টয়লেটে ফেলে এসেছিলাম। ফুল দেবার পর থেকে ফখরুল মিতাকে দেখলেই কেমন নয়া মজনুর চোখে তাকিয়ে থাকতো। আমি মিতাকে কটাক্ষ করে বলতাম,
'তোর প্রেমিক ভাগ্য ভালো।' এ কথায় মিতা খেপে যেত।

সুন্দরী মেয়েরা জানে তাদের পেছনে ছেলেরা মৌমাছির মত ঘুরতে থাকে। তাদের নিয়ে অনেক গুঞ্জণ। এই ঘুরপাক ও গুঞ্জণ সুন্দরী মেয়েরা এনজয় করে। অসংখ্য প্রেমিক হৃদয়ের আকুলতা তারা পায়ে মাড়িয়ে এগিয়ে যায় কখনো নিঃসংকোচে, কখনো বাঁকা হাসির ঝিলিক ছড়িয়ে কখনো বা 'ও আচ্ছা!' ধরনের রাজশ্বরী ভঙ্গিমায়। কিন্তু মিতা লজ্জায় কুকড়ে যেত । কেউ প্রেম নিবেদন করলে ও রেগে

যেত। সুন্দরী মেয়েদের রাগের উত্তাপে সৌন্দর্য পিপাসু পুরুষ দমে যায় না। মিতার হৃদয় জয় করার চেষ্টা অনেকে করে যেতে থাকে। ফার্স্ট ইয়ার থেকে সেকেন্ড ইয়ার পর্যন্ত প্রেমিকদের উপদ্রবে মিতা ছিল বিব্রত। এইচএসসি পাশ করার পর মিতা কলেজে আসা বন্ধ করে দেয়। এর জন্য অবাকও হই নি। আমাদের দেশে সুন্দরী মেয়েরা কলেজে উঠলেই ওদের বিয়ের হিরিক লেগে যায়। এইচএসসি পাশ করার পর খুব কম সংখ্যক মেয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যায়। দীর্ঘদিন কলেজে না আসায় আমি ধরে নিই মিতা লেখাপড়া ছেড়ে সংসার করছে। অনেক সহপাঠীর মত মিতাও হারিয়ে যায় আমার জীবন থেকে। ওর খোঁজ নেবার ইচ্ছে হয় নি। কালের স্রোতে ভেসে যেতে যেতে ভুলে গিয়েছিলাম মিতার কথা। কিন্তু আজ এতোদিন পর মিতাকে দেখে শুধু অবাকই হলাম না, হতবাক হয়ে গেলাম ওর আমূল পরিবর্তন দেখে। ওর সাথে আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে গেল বেইলী রোডে ফটোম্যাটিক স্টুডিওতে। এই স্টুডিওর ছবি খুব সুন্দর হয়। আমি চাকুরির জন্য এখানে ছবি তুলেছিলাম। চাকুরির জন্য বায়োডাটা দিতে দিতে ছবি ফুরিয়ে যায়। আমাকে আবার আসতে হয় ছবি রিপ্রিন্ট করার জন্য। আজও এলাম। স্টুডিওতে ছবির রিপ্রিন্টের অর্ডার দিচ্ছিলাম। আমার পাশ থেকে মিষ্টি নারী কণ্ঠ রিনরিনিয়ে উঠলো,
'আপনার নাম কী আকাশ!'
পাশে তাকিয়ে দেখি অপূর্ব এক সুন্দরী মহিলা আমার দিকে প্রশ্নবোধক চোখে তাকিয়ে রয়েছেন। আমি মিতাকে প্রথমে চিনতে পারলাম না।
'হ্যাঁ, কিন্তু ..!'
'আকাশ! কেমন আছিস!'
আপনি থেকে তুই। আমি আরো অবাক হয়ে যাই। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি।
'হ্যাঁ করে তাকয়ে আছিস কেন? আমাকে চিনতে পারছিস না? আমি মিতা!'

আমার মাথা যেন শূন্য হয়ে যায়। কিংবা অতিরিক্ত বিস্ময়ে থ হয়ে যাই।
‘অমন করে তাকিয়ে থাকলে হবে? চল বাইরে যাই।’
মিতা আমার হাত ধরে ফটোমেটিক স্টুডিও থেকে বের করে নিয়ে এলো। ফুটপাতে পার্ক করা একটি লাল রঙের টয়োটা কারের সামনে এসে মিতা দাঁড়ালো। গাড়ির ড্রাইভার এসে পেছনের গেট খুলে ধরলো। মিতা আমার হাত ছেড়ে গাড়িতে ঢুকে পড়লো। বললো,
‘আকাশ, গাড়িতে উঠ।’
মিতাকে দেখে আমি খুবই আনন্দিত। আমার বিস্ময়ের রেশ যেন কাটছিল না। আমি গাড়িতে উঠলাম। বসলাম মিতার পাশে। মিতা ড্রাইভারের উদ্দেশে বললো,
‘ড্রাইভার, গুলশান যাও।’
আমার দিকে তাকিয়ে বললো,
‘আমাকে দেখে তুই খুব অবাক হয়ে গেছিস?’
‘হ্যাঁ, এখনো বিস্ময়ের রেশ যেন কাটছে না।’
‘তোকে দেখে আমিও অবাক হয়ে গেছি। খুব ভালো লাগছে। কতদিন পর দেখা!’
‘হ্যাঁ, তোকে কেমন রাণী রাণী রাগছে। তুই অনেক বদলে গেছিস।’
‘রাণী নয়, বল মহারাণী! তা তোরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। একটু মোটা হয়েছিস’।
‘তুই মোটা হলেও তোকে অপূর্ব লাগছে!’
‘তাই নাকি!’
‘হুম্। তোর দিক থেকে চোখ ফেরানো যাচ্ছে না।’
‘তুই তো দেখছি, মেয়ে পটাতে শিখে গেছিস!’
মিতার কথায় খানিকটা লজ্জা পেলাম। নিজের পক্ষ নিয়ে বললাম,

‘তোকে পটানোর কি আছে? তুই কি আমার কামনার নারী?’
‘তুই কি আমাকে কখনোই কামনা করিস নি!’
মিতা বিস্ময় প্রকাশ করলো।
‘না। কখনোই না।’
আমার কথায় ও হাসির দমকায় ফেটে পড়লো। যেন আমি মিথ্যা কথা বলছি।
‘তোর সাথে একদিন সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম, মনে আছে?’
‘হুম্।’
‘সেদিন সিনেমা হলে তুই আমার হাত চেপে ধরিস নি?’
আমি হো হো করে হেসে উঠি। বললাম,
‘সেদিন আমি তোর হাত ধরি নি, তুই আমার হাত টেনে নিয়ে ধরেছিলি’।
‘তাই নাকি!’
‘হ্যাঁ, আমার স্পষ্ট মনে আছে।’
‘ঠিক আছে, তোর কি সেদিন ভালো লাগে নি?’
‘ভালো লাগার চেয়ে ভয়টা ছিল বেশি।’
‘তুই কিন্তু তোর হাতটা সরিয়ে নিস্ নি। নিশ্চয়ই তোর ভালো লেগেছিল। তার মানে অবচেতন মনে হলেও তুই আমাকে কামনা করতিস।’
‘এ কথা ভেবে তুই কি আনন্দ পাচ্ছিস?’
‘পাচ্ছি। আচ্ছা আকাশ, তুই সেদিন কেন আমার হাতটা ছেড়ে দিয়েছিলি?’
মিতা এবার সিরিয়াস হয়।
‘হাত ধরে রাখাটা হতো বেলাল্লাপনা। আজ এতাদিন পর এই প্রশ্ন করছিস কেন?’
‘এমনিই জানতে ইচ্ছে করছে। যাক গে, এখন বল কেমন আছিস?’
‘ভালো আছি বলতে পারছি না। একটি চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছি।

বেকারত্বের যন্ত্রণায় ছটফট করছি।'
'তুই নিশ্চয়, লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়েছিস?'
'হ্যাঁ, মাস্টার্স পাশ করে বসে আছি।'
'ঠিক আছে, আমি তোর জন্য চেষ্টা করবো। হয়তো পেয়ে যেতেও পারিস যে কোন একটা চাকরি।'
'তোর স্বামী কি খুব ধনী বা ক্ষমতাবান?'
এ কথায় খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো মিতা। ও বললো,
'তুই যে মিতাকে চিনতিস, আমি এখন আর সেই মিতা নেই। আমি নিজেই অনেক ক্ষমতাবান। হ্যাঁ, আমার স্বামী ধনী ও ক্ষমতাবান ছিল।'
'ছিল মানে! এখন কি নেই?'
'না। এখন আমার স্বামী নেই।'
'কি হয়েছে খুলে বল তো!'
'সে অনেক কথা। তোকে অন্য একদিন বলবো। শুধু জেনে রাখ, স্বামী আমাকে দিয়ে যা করাতো, আমি তাই-ই করছি। শুধু শুধু স্বামীকে লভ্যাংশ হাতিয়ে নিতে দেব কেন?'
'ঠিক বুঝলাম না।'
'তোকে বুঝতে হবে না। সংক্ষেপে বলছি, শোন, আমার একজন ধনী লোকের সাথে বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর ধনী স্বামী আরো উপরে উঠার জন্য আমাকে অন্ধকারে ঠেলে দেয়। আমি হয়ে যাই অন্ধকারের জগদ্দল এক পাথর!'
মিতার কণ্ঠ ভারি হয়ে আসে। আমি বিব্রত হই। এতদিন পর দেখা হলো! দেখে মনে হয়েছিল মিতা ভালোই আছে, এখন মনে হচ্ছে ও সুখে নেই। মিতা বললো,
'জানিস, পাথর কাঁদতে পারে না। আমিও কাঁদি না।'

মিতা ফুঁপিয়ে উঠলো। মেয়েদের কান্নার সামনে আমি ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে যাই। কী বলে সান্তনা দেব বা কী বলবো, ঠিক করতে পারি না। মনে হচ্ছে মিতা কেঁদে ফেলবে। আমি বলি,

‘মিতা, তোকে দেখে প্রথমে ভেবেছিলাম তুই ভীষণ ভালো আছিস, সুখে আছিস। এখন মনে হচ্ছে আমার ধারনা ভুল।’

মিতা মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিল। বললো,

‘সরি, অনেক দিন পর তোকে দেখে আগের আমাকে মনে পড়ে গেল। তুই কিছু মনে করিস না। আমি ভালোই আছি।’

‘আমি কি তোর জন্য কিছু করতে পারি?’

মিতা হাসলো। ওর হাসিতে মাদকতা আছে। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। মিতা বললো,

‘তুই আমাকে বিয়ে করতে পারবি?’

ওর প্রশ্নে আমি চমকে উঠি।

‘বিয়ে!’

‘হ্যাঁ, বিয়ে। পারবি?’

মিতা প্রশ্নভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসতে লাগলো। হাসির দমকায় ওর শরীর কাঁপছিল। ও বললো,

‘আমি জানি, তুই ভড়কে গেছিস। আকাশ, যেদিন তুই সিনেমা হলে আমার হাত ছেড়ে দিয়েছিল, সেদিন থেকে মিতা হারিয়ে গেছে। তোর সুন্দর জীবনে আমার কালো ছায়া ফেলবো না। তোর সাথে ফান করলাম।’

‘তা বুঝলাম, কিন্তু..?’

‘আমাকে নিয়ে তোর ভাবতে হবে না। এখন বল তুই বিয়ে করেছিস কিনা। বা কারো সাথে প্রেম করছিস কিনা।’

‘বিয়ে বা প্রেম!’

‘জানি, তোর মধ্যে প্রেম-ট্রেম নেই। তুই ভীতু ও আত্মকেন্দ্রিক’।

‘তাই?’

‘হ্যাঁ, তবুও ভয়কাতুরে ও পরাজিতকে কেউ কেউ ভালোবেসে ফেলে। তেমন কেউ আছে?’

এই প্রশ্নে আমার মনে সিমির ছবিটা ভেসে উঠে। বুকের ভেতরটা কে যেন মোচর দেয়। মিতাকে প্রশ্ন করি,

‘মিতা, আমি কি সত্যিই পরাজিত মানুষ?’

‘তোকে যেমন দেখেছি, তাতে তুই সে রকমই। তোকে আজও দেখে বুঝতে পারছি, তুই বদলাস নি’।

‘বাহ্, আমাকে তুই এতটা মনে রেখেছিস! তা আমার প্রতি তোর সাজেশন কি?’

‘তোর সামনে এখনো অনেক পথ। তুই নিজেকে নিজের ভেতর থেকে জাগিয়ে তোল। দেখবি, তুই এক সময় ঠিক-ই জিতে যাবি।’

‘আমার সম্পর্কে তোর আর কি ধারনা?’

‘তোর মধ্যে চাওয়ার আকাঙ্খা নেই। তাই পাওয়ার চেষ্টাও নেই। তুই স্বপ্ন দেখতে জানিস না’।

‘স্বপ্ন!’

‘হ্যাঁ, জেগে ওঠ, স্বপ্ন দেখ। দেখবি জীবন কত সুন্দর!’

‘মিতা,চাকুরি ছাড়া আমার কোন স্বপ্ন নেই। আর কোন স্বপ্ন দেখতেও পারি না।’

‘তুই একাই এ দেশের শিক্ষিত বেকার নস্। দেশে প্রায় দু’ লাখ শিক্ষিত বেকার আছে। তারা কি প্রেম করছে না? জীবন সাজানোর স্বপ্ন দেখছে না?’

‘প্রেমটাই কি জীবনের মূখ্য বিষয়?’

‘কখনো কখনো শুধু মূখ্য নয়, গুরুত্বপূর্ণও। দেখ, আমার জীবনে প্রেম থাকলে হয়তো প্রেমিকের দরিদ্র সংসারে কষ্ট শেয়ার করতাম। কিন্তু ধনী স্বামীর স্ত্রী হয়ে অন্ধকারের কীট হতাম না। মাঝেমাঝে ভালোবাসার জন্য খুব আফসোস হয়।’

‘তোর হাহাকার আমাকে কষ্ট দিচ্ছে।’

‘আমাকে নিয়ে অহেতুক কষ্ট পাস নে। নিজের ব্যক্তিগত কষ্ট থাকলে তা লাঘবের চেষ্টা কর।’

‘ধন্যবাদ, এ পরামর্শের জন্য। এখন বল, আমরা কোথায় যাচ্ছি?’

‘গুলশানে। আমার অ্যাপার্টম্যান্টে। এর আগে আমরা ভালো কোন রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ খাবো।’

‘তোর বাসায় আজ যাবো না। বিকেলে আমি একটি টিউশনি করি। অন্য একদিন যাবো।’

‘ঠিক আছে, চল, গুলশানের ইকবাল টাওয়ারে যাই। ইকবাল টাওয়ারের রেস্টুরেন্টে দু’জনে লাঞ্চ করি।’

‘আচ্ছা।’

মিতার গাড়ি ফার্মগেটের সড়ক দিয়ে ছুটে চলছে গুলশানের দিকে। চলন্ত গাড়িতে আমি নিজেকে নিজের আয়নায় দাঁড় করিয়ে খুঁজতে থাকি স্বপ্নের বিলাসিতা।

ঢাকা শহরের আবাসিক এলাকায় ব্যাচেলারদের বাসা ভাড়া পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। বাড়িওয়ালারা ব্যাচেলারদের বাসা ভাড়া দিতে চান না। ব্যাচেলার শুনলে ভ্রু কুঁচকে উঠে তাদের। কেউ কেউ মুখের ওপর দরোজা বন্ধ করেও দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ছেড়ে দেবার সময় কোথায় উঠবো ঠিক করতে পারছিলাম না। বাসা খুঁজতে গিয়ে বুঝতে পারি ব্যাচেলারদের সম্পর্কে বাড়িওয়ালারা ভালো ধারনা পোষণ করেন না। তন্ন তন্ন করে বাসা খুঁজলাম। বাসা পেলাম অনেক, কিন্তু ব্যাচেলার বলে বাসা ভাড়া দিতে রাজী হলেন না বাড়িওয়ালারা। নিজের গ্রামে ফিরে যাবো, সেই অবস্থাও নেই। চাচার মৃত্যুর পর তার সংসারের অবস্থা বেহাল হয়ে পড়েছে। নিজে কোন সহযোগিতা করতে পারছি না, আবার সংসারের দায় বাড়াতে ইচ্ছে করলো না। কিন্তু কোথায় থাকবো, তারও কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এমনি সংকটকালে ত্রাণকর্তার ভূমিকা পালন করলেন শিল্পী সমীরণ চৌধুরী। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তার সাথে আমার পরিচয়। আমরা যখন অনার্স ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়তাম, সমীরণ চৌধুরী তখন চারুকলার শেষ বর্ষের ছাত্র। চারুকলার বকুল তলায় তিনি আড্ডা মারতেন, ছবি আঁকতেন। আমরা প্রায়ই আড্ডা দিতে যেতাম বকুল তলায়। এখানে সমীরণ চৌধুরীর সাথে পরিচয় হয়। তিনি চারুকলা থেকে বের হয়ে গেছেন তিন বছর আগে। কিন্তু তার সাথে আমার যোগাযোগটা বিচ্ছিন্ন হয় নি। তিনি আড্ডা মারতে আসতেন চারুকলায়। মাঝেমাঝে দেখা হয়ে যেত আমার সাথে। তাকে আমার সমস্যার কথা জানালাম। আমার থাকার কোন জায়গা নেই শুনে তিনি বললেন,

‘তোমাকে থাকার একটা জায়গা দিতে পারি, তবে শর্ত আছে।’

‘বলুন কি শর্ত?’

আমি উদগ্রীব।

‘আমি বড় মগবাজার এলাকায় একটা রুম নিয়েছি। চার তলা বাড়ির ছাদে এক রুমের ছোট্ট বাসা। ছোট্ট একটা কিচেন ও বাথরুম আছে। বাসাটা আমার আত্মীয়ের বলে নিতে পেরেছি। বুঝলে?’

‘বুঝলাম। কিন্তু শর্তের কথা তো বললেন না। তাছাড়া এই বাসায় আপনি থাকলে আমিই বা থাকি কি করে?’

‘ঐ বাসায় আমি থাকি না। আমি দিনের বেলায় ঐ রুমে ছবি আঁকি। বলতো পারো, শিল্পীর স্টুডিও রুম। এই রুমে তুমি রাতে থাকতে পারো।’

‘শুধু রাতে?’

‘হ্যাঁ, শুধু রাতে। দিনেও থাকতে পারো। তবে আমাকে কোন বিরক্ত করতে পারবে না। তাছাড়া তুমি দিনে বাসায় থেকে কী করবে? ধরো রাতে তুমি থাকলে, দিনে বেরিয়ে গেলে। আবার আমি দিনের বেলায় আসলাম এবং সন্ধ্যায় চলে গেলাম। তোমার কাজ হলো। আমারও কাজ হলো।’

‘নট ব্যাট। আর কোন শর্ত?’

‘বাসায় কোন গেষ্ট আনবে না। ব্যাচেলারদের বাসায় গেষ্ট বেশি আসে। অনেক সময় মেয়ে বন্ধুও আসে। এ সব বাড়িওয়ালারা পছন্দ করেন না।’

‘আমি এই শর্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো। রুম পার্টনার হিসাবে মাসে ভাড়া কত দিতে হবে?’

‘আমি ১৫ শ’ টাকা মাসে ভাড়া দিচ্ছি। তুমি মাসে ৫ শ’ টাকা দিবে। তোমার জন্য বিশেষ ছাড়। ঠিক আছে?’

‘ঠিক আছে।’

সেদিনই আমি উঠে যাই শিল্পীর স্টুডিওতে। সমীরণ চৌধুরীর শর্ত পালন করতে আমার কোন বেগ পেতে হয় নি। আরিফ শুধু আমার বাসার ঠিকানা জানে। ও

কখনো আসে নি। কিন্তু আমাকে আজ ভীষণ অবাক করে দিল বাড়ির দারোয়ান মফিজ মিয়া। সকাল ১১টা। আমি বাইরে বের হবার জন্য প্রস্তুত। এমন সময় দরোজায় করাঘাতের শব্দ শুনতে পেলাম। গত দুই বছরে আমার বাসার দরোজায় কেউ করাঘাত করে নি। আমি দরোজা খুলতেই দেখি মফিজ মিয়া দাঁড়িয়ে রয়েছে।

‘কী ব্যাপার মফিজ মিয়া, তুমি!’

‘জ্বি, স্যার। একজন মহিলা আপনার কাছে আইছেন। বললেন, আপনাকে তেনার খুব দরকার।’

‘মহিলা!’

আমার বিস্ময়ের রেশ না ফুরাতেই মফিজ মিয়ার পাশ থেকে এগিয়ে এলেন একজন মহিলা। বললেন,

‘আপনার নাম কি আকাশ?’

‘হ্যাঁ, কিন্তু আপনি..?’

‘আমি সিমির বোন, রিমি।’

‘ওহ্! তা আপনি এ বাসায়! ঠিকানাই বা পেলেন কীভাবে!’

‘এত প্রশ্নের জবাব এক সাথে দেয়া যাবে না। আমি কি আপনার বাসার ভেতরে আসতে পারি?’

‘হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, আসুন।’

আমি দরোজা থেকে সরে দাঁড়াই। ভেতরে বসার একটি চেয়ার আছে। ওটার একটা হাতল ভাঙ্গা। আমি হাতলভাঙ্গা চেয়ারটি এগিয়ে দিই নিঃসংকোচে। রিমি ওতে বসেন। আমি বসি খাটে। আমার ভেতরে অজস্র প্রশ্ন আর অস্বস্থি। মফিজ মিয়া দরোজা থেকেই বিদায় নিল।

‘আপনার কি বাইরে বেরুবার খুব তাড়া আছে?’

‘জ্বি, না। আপনি বলুন কেন এসেছেন? এসেছি আপনার সহযোগিতা চাইতে।’

‘আপনি বিরক্ত হয়েছেন, বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনার কাছে না এসে পারলাম না।’

‘ঠিক আছে, আপনি বলুন, আমি আপনার কি সাহায্য করতে পারি।’

‘আমরা একটা সমস্যার মধ্যে পড়েছি। আপনিই পারেন এই সমস্যা থেকে আমাকে ও সিমিকে উদ্ধার করতে।’

‘ঠিক বুঝলাম না। খুলে বলুন।’

‘আপনি তো জানেন, আনিস সিমিকে বিয়ে করতে চাইছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘আপনি কি জানেন, আনিসের সাথে আমার..?’

‘শুনেছি, আপনাদের মধ্যে..। ’

‘আমি আনিসকে ভালোবাসতাম। দেখুন আমি চাইনা, সিমি আনিসকে বিয়ে করুক।’

‘তা আমি কি করতে পারি?’

‘আপনি এই বিয়েটা আটকাতে পারেন।’

‘আমি! কীভাবে?’

‘আপনি আনিসকে বিয়ে না করার জন্য সিমিকে অনুরোধ করতে পারেন।’

‘আমার অনুরোধ সিমি কেন রাখবে?’

‘আমি জানি,সিমি আপনারই অনুরোধ রাখবে।’

‘আপনি ওর বোন, আপনি অনুরোধ করলেও রাখবে।’

‘এটা আমার জন্য বিব্রতকর। আমার ব্যক্তিগত কষ্ট আর লজ্জার কথা ওকে বলতে চাইনা।’

‘প্রেম করার মধ্যে লজ্জার কী আছে?’

‘প্রেম করে হেরে যাবার লজ্জা আছে। সব হারানোর লজ্জাও আছে। আপনি কি আনিসের চরিত্র সম্পর্কে কিছু জানেন না!’

‘প্রেম করাটা ওর হবি বলেই জানি।’

‘প্রেম নয়, প্রেমের অভিনয় করে মেয়েদের সর্বনাশ করাটাই ওর হবি। ও একটা লম্পট!’

এ পর্যন্ত বলে রিমি শাড়ির আঁচলে মুখে চেপে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। কান্নার সামনে আমি বিব্রত হয়ে যাই।

‘রিমি, আপনি কাঁদবেন না, প্লিজ।’

রিমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। আমিও চুপ। নীরবতা ভেঙ্গে রিমি নরম কণ্ঠে বলে, ‘আমি উপায়হীন হয়ে আপনার কাছে এসেছি। আপনার ঠিকানা নিয়েছি আপনার বন্ধু আরিফের কাছ থেকে। কথায় কথায় সিমির কাছ থেকে আরিফের টেলিফোন নম্বর নিয়েছিলাম। অনেক কষ্ট করে আপনার কাছে এসে পৌঁছেছি। আমার অনুরোধটা রাখুন, প্লিজ।’

‘দেখুন, আনিসও আমার বন্ধু। ও জানলেও তো ভাববে বন্ধু হয়ে আমি ওর ক্ষতি করেছি।’

‘আপনার কাছে কী সিমির সর্বনাশটা বড় নয়?’

রিমির কথায় আমি হচকিত হয়ে যাই। কোন জবাব দিতে পারি না।

‘চুপ করে আছেন যে! আমি যতটুকু জানি, সিমিকে আপনি পছন্দ করেন।’

‘তাতে কি?’

‘সিমির ভালোর জন্য বন্ধুর বিরুদ্ধে যেতে পারবেন না?’

প্রশ্ন নয়, যেন বিবেকের পিঠে চাবুকের সপাং আঘাত। আমি কোন জবাব খুঁজে পাই না। রিমির ভেজা চোখের দিকে তাকিয়ে বলি,

'রিমি, আমি আনিসকে বিয়ে না করার জন্য সিমিকে অনুরোধ করবো।'

'কথা দিচ্ছেন?'

'কথা দিচ্ছি।'

'তাহলে আমি আসি। আপনার সহযোগিতার কথা আমার মনে থাকবে। আর হ্যাঁ, আমি আপনার কাছে এসেছিলাম, তা কখনো সিমিকে বলবেন না।'

'আচ্ছা।'

সিমি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়। আমি বলি,

'বসুন, আমি চা তৈরি করে দিচ্ছি। বাসায় এলেন, কিছু মুখে না দিয়ে..'

'ধন্যবাদ, ব্যাচেলার বলে আতিথিয়েটা গ্রহণ করলাম না। আমি যাচ্ছি।'

সিমি খোলা দরোজার দিকে এগিয়ে গেল। আমি বললাম,

'বাইরে একটু অপেক্ষা করুন, আমিও বের হচ্ছি। আপনাকে খানিকটা পথ এগিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে।'

রিমি রুমের বাইরে গিয়ে আপেক্ষা করতে লাগলো। আমি দ্রুত বাসার চাবি নিয়ে বের হয়ে দরোজায় তালা লাগিয়ে দিলাম। আমরা সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নামলাম। গেটের সামনে মফিজ মিয়া আমাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো। আমি মনে মনে মফিজ মিয়ার উদ্দেশে বললাম, 'স্টুপিট!'

‘হ্যালো, সিমি!’

‘হ্যাঁ, কেমন আছো আকাশ?’

‘ভালো। তুমি?’

‘ভালোই। তোমার মত।’

‘তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।’

‘বল।’

‘ঠিক কথা নয়, অনুরোধ করতে চাই।’

‘ভনিতা করছো কেন? বলে ফেল।’

‘তুমি আনিসকে বিয়ে করবে না।’

ও প্রান্ত থেকে কোন শব্দ পাওয়া গেল না।

‘চুপ করে আছো যে!’

‘কেন আনিসকে বিয়ে করতে না করছো।?’

‘এমনিই।’

‘এমনি-এমনিই কি বিয়ে ভেঙ্গে দেয়া যায়?’

‘দেয়া যায় না?’

‘না। বিয়ে ভাঙ্গতে উল্লেখযোগ্য কারণ লাগে।’

‘আমার অনুরোধ কি উল্লেখযোগ্য নয়?’

‘তোমার অনুরোধ আমার কাছে হয়তো উল্লেখযোগ্য, কিন্তু আমার পরিবারের কাছে উল্লেখযোগ্য নয়।’

‘তাহলে..?’

‘তুমিই বলো। কীভাবে ভেঙ্গে দেব বিয়ে। কী কারণে ভাঙ্গব?’

‘আনিসকেই তোমার বিয়ে করতে হবে কেন?’

‘অন্য কাকে করবো? আর কে আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছে?’
‘আনিসকে বিয়ে না করলেও তোমার জন্য পাত্রের অভাব হবে না।’
‘পাত্র হিসাবে আনিস ভাইয়ের অযোগ্যতা কি?’

‘আনিস! আনিসকে বিয়ে করে তুমি সুখি হতে পারবে না।’
‘ভবিষ্যত বাণী করছো? জ্যোতিষ শাস্ত্র শিখলে কবে?’
‘ভবিষ্যত বাণীর জন্য বলছি না। আনিস তোমার উপযুক্ত পাত্র নয়।’
‘কে আমার উপযুক্ত পাত্র?’
‘অনেকেই।’
‘আমি অন্তত একজনের নাম শুনতে চাচ্ছি।’
‘সিমি, তুমি আজ অনেক তর্ক করছো।’
‘তর্ক নয়, জানার চেষ্টা করছি। তাছাড়া বিয়ে ভেঙ্গে দেবার অনুরোধ রাখতে হলে আমাকে তো সব দিক বিবেচনা করতে হবে। তাইনা?’
‘আমি ভেবেছিলাম, আমার অনুরোধ রাখবে।’
‘রাখবো না, তা তো বলিনি। জানতে চাচ্ছি তুমি এই অনুরোধ কেন করছো?’
‘সব কথা খুলে বলা যায় না। তুমি কী সত্যিই আনিসকে বিয়ে করতে রাজি?’
‘আমাদের পরিবারের সবাই তো তাই চাইছেন। বিয়ের দিনক্ষণও ঠিক হয়ে গেছে। ২২ সেপেটম্বর আমার বিয়ে। এক সপ্তাহ পর এনগেজম্যান্ট। সময় আছে মাত্র তিন সপ্তাহ। আমি কার জন্য, কেন এই বিয়ে ফিরিয়ে দেব? তুমিই তো বলেছিলে আমরা সমাজ ও পরিবারের কাছে দায়বদ্ধ।’
‘যোগ্য লোককে বিয়ে করার কথাও আমি বলেছিলাম।’

‘আনিস ভাইয়ের অযোগ্যতা কম কিসে? তিনি শিক্ষিত ও বিত্তবান। তাদের পরিবারের পরিচিতি, প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক মর্যাদা অনেক উঁচুতে।’

‘ সিমি, আমি ঠিক..’

‘বল, বলছো না কেন?’

‘আনিসের কিছু সমস্যা আছে। এ সব কথা স্পষ্ট করে তোমাকে বলতে পারবো না।’

‘আমি জানি, তুমি কী বলতো চাও বা বলতে পারছো না।’

‘চারিত্রিক ত্রুটিটুকু বাদ দিলে আনিসের আর সব কিছু আছে। তাইনা?’

‘সিমি!’

‘অবাক হচ্ছো? আনিসকে তুমি এত সহজেই হারিয়ে দিতে চাও? শুধু একটি মাত্র অনুরোধে!’

‘সিমি, আমি আর কিছু বলতে চাই না।’

‘তুমি অনুরোধ করছো, আর.. ।’

‘আমার অনুরোধ ফিরিয়ে নিচ্ছি।’

‘পিছিয়ে গেলে?’

‘আমি ধরে নেব, তোমার সাথে আমার পরিচয়টা ছিল কোন এক স্বপ্নের একখন্ড চিত্রনাট্য।’

‘হার মানাটা তোমার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে।’

‘হয়তো বা। হারতে হারতেই আমি জিতে যাব একদিন।’

‘জয় করার ইচ্ছাই তোমার মধ্যে নেই, জয় করার শক্তি কোথায় পাবে?’

‘পাওয়ার আনন্দের কথা জানি না, হারানোর বেদনা সহ্য করার শক্তি আমার আছে।’

‘তুমি কেবল পালাতে চাও। মুখোমুখি হতে চাও না। কেন?’
‘আমি পরাজিত মানুষের দলের একজন।’
‘এ তোমার আত্মপক্ষের দুর্বল ঢাল। আসলে তুমি কাপুরুষ!’
‘সি-মি!’
‘খুব লাগলো বুঝি!’
‘আমি, আমি..!’
‘জেনে রেখো, এ বিয়ে আমি করছি। কথা বলছো না কেন? তুমি নিশ্চয়ই বিয়েতে আসবে? আসবে না? হ্যালো..!’
ফোনটা রেখে দিলাম। আমার হাত কাঁপছে। বুকের ভেতর কষ্টের শীতল একটা ধারা বয়ে গেল। বিল দিয়ে টেলিফোন বুথ থেকে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। হাঁটতে শুরু করলাম। কিন্তু পা চলতে চাইছে না। সকালের রোদেলা আকাশটা যেন ভেঙ্গে পড়ছে মাথার ওপর!

৯

বৃষ্টি হলে ঢাকা শহরটা যেন নদী হয়ে যায়। বৃষ্টির পানিতে ডুবে থাকে গলির পথ, রাজপথ, ফুটপাত। মানুষের চলাচল কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। যাদের গাড়ি আছে, তাদের বিড়ম্বনারও শেষ নেই। জলাবদ্ধ রাস্তায় গাড়ি চালানো বিপদজনক। আবার বৃষ্টির দিনে রিকশাওয়ালাদের ব্যবসা জমে উঠে। বৃষ্টির দিনে সুবিধাবাদী ব্যবসায়ীদের মত রিকশাওয়ালারাও চড়া দাম হাঁকে। বিপর্যস্ত নগরবাসীর অতিরিক্ত অর্থ খরচ করতে হয় যাতায়াতে। বৃষ্টি নিয়ে কবিরা কাব্যময়তায় মুখর হলেও নাগরিক জীবন ঠিক এর উল্টো। কাব্য নয়, যেন বিদ্রুপময় গদ্য। বৃষ্টি মানে হাঁটু জলে চলাচল। বৃষ্টি মানে খানাখন্দ ভরা রাস্ড়ায় ঝুঁকি নিয়ে পথ চলা। আজ অঝোর

ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। সকাল থেকে বিরামহীন বৃষ্টি। নগরী কেমন চুপসে গেছে। কিন্তু মানুষ থেমে নেই। বৃষ্টি মাথায় ছুটছে সবাই যে যার গন্তব্যে। আমি সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত বাসায়। মূষল ধারে বৃষ্টি হলে সমীরণ চৌধুরী আসেন না। এক রুমের রাজ্যে আমি তখন একাই রাজা। বিকেলে বাসা থেকে বের হলাম। তিতলিকে পড়াতে হবে। প্যান্ট গুটিয়ে ও স্যান্ডেল হাতে নিয়ে হাঁটু পানি ভেঙ্গে গলির মোড়ে আসতেই একটি রিকশা পেয়ে গেলাম। বিনয় কণ্ঠে রিকশাওয়ালাকে বললাম,

‘নিউ ইস্কাটন যাবে?।’

‘দশ ট্যাকা।’

রিকশাওয়ালার তাচ্ছিল্যের জবাব।

‘ঠিক আছে, চল।’

আমি অনেকটা লাফিয়ে রিকশায় চড়ে বসি। নইলে অন্য কেউ রিকশায় চড়ে বসতে পারে। বৃষ্টির দিনে দাম-দর করে রিকশায় উঠা মুশকিল। দেখা যায়, একজন দাম করছে, অন্য একজন উঠে বসে বলে, ‘যাও’। রিকশাওয়ালারা প্যাসেঞ্জারের অধিকার নিয়ে মাথা ঘামায় না। কে বেশি টাকা দেবে, তারা তা-ই দেখে। আমি রিকশায় বসে ভাবতে লাগলাম, তিতলিকে পড়ানোর পর কী করবো। মনে পড়ে গেল সন্ধ্যায় মিতাকে ফোন করতে হবে। মিতার সাথে আমি টেলিফোনে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি। ও কাল বলেছে আমার চাকুরির জন্য খুব চেষ্টা করছে। ভাবি, আমার চাকুরি ঠিক করে দিতে দু’জন মহিলা বেশি আগ্রহী। মিতা ও তামান্না হোসাইন আমার চাকুরির জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিন্তু নিজের যোগ্যতায় একটা চাকুরি হবে, এমন সম্ভাবনা দেখছি না। হায়রে দেশ! বন্ধুরা বলে, দেশে একটা চাকুরি পেতে হলে যোগ্যতার চেয়ে ঘুষ বা মামার টেলিফোন লাগে। অর্থাৎ মোটা অংকের অর্থ বা প্রভাবশালী ব্যক্তির ফোন না হলে কারো চাকুরি হবে, এ কথা কেউ

হলফ করে বলতে পারে না। দুর্নীতি আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সচিবালয় পর্যন্ত সর্বত্র দুর্নীতির শেকড় ছড়িয়ে গেছে। দুর্নীতিতে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে চ্যাম্পিয়নের ইতোমধ্যে কু-মর্যাদা লাভ করেছে। এ নিয়ে সরকারি ও বিরোধী দলের মধ্যে তর্ক যুদ্ধ বাঁধলেও সাধারণ লোক দুর্নীতির করাল গ্রাসে জর্জরিত। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। নির্যাতিতরা বিচার পাচ্ছে না। অপরাধী ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে থানা বা জেল থেকে। ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে, পেনশনের টাকা তুলতে বিড়ম্বনা। সর্বত্র প্রকাশ্যে ঘুষের লেনদেন চলছে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও দূষণ, সন্ত্রাসের বিস্তার, মূল্যবোধের অবক্ষয় মাত্রাতিরিক্ত জনগোষ্ঠী এই দেশকে অবনতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অরাজকতা যত বাড়ছে, আমাদের বিবেকের দরোজা তত যেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমরা যখন স্বপ্নহীন চোখে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে হাতরে পথ চলছি, তখন ভালোবাসাবাসির সাতকাহন নিয়ে পড়ে থাকা যায়? দেবদাস হওয়া সহজ, কিন্তু দায়িত্ব নেয়া সহজ নয়। এ কথা মনে এলেই সিমির জন্য আমার কোন কষ্ট থাকে না। আমি সিমিকে ক্ষমাও করে দেই। সিমি আমাকে যে আঘাত করেছে, তার জন্য কোন অভিযোগ থাকে না। ভাবি, আমাকে ‘কাপুরুষ’ ভেবে সিমি হয়তো এক সময় বিব্রত হবে, কিন্তু ওকে কখনো অনুশোচনার আগুনে পুড়তে হবে না। ভালো লাগার চেয়ে ভালো থাকার গুরুত্ব অনেক বেশি। সিমি কি একদিন এই সত্যটুকু উপলব্ধি করতে পারবে? রিকশায় বসে আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম এ সব কথার অতলে। রিকশাওয়ালার কথায় চিন্তার ছেদ কাটে।

‘স্যার, কই নামবেন?’

তাকিয়ে দেখি তিতলিদের অট্টালিকা ছাড়িয়ে এসেছি। রিকশাওয়ালাকে বলি,

‘একটু পেছনে যাও।’

রিকশাওয়ালা বিরুক্ত হয়। রিকশা ঘুরিয়ে নেয় সে। তিতলিদের অট্টালিকার সামনে রিকশা আসতেই বলি,

‘থামাও, আমি এখানে নামবো।’

রিকশাওয়ালাকে ১০ টাকার একটি নোট দিয়ে নেমে পড়ি রিকশা থেকে। এপার্টম্যান্টের সিকিউরিটির লোক আমাকে চেনে। সিকিউরিটির লোকের দিকে তাকিয়ে হেসে আমি দ্রুত লিফটে ঢুকে পড়ি। পাঁচ তলার বাটম টিপতেই লিফট ছুটে চললো। লিফট কত দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। ভাবি, চাকুরি পেতে যদি এমন একটি লিফট পেতাম! এ কথা ভাবতেই নিজের মনে হেসে উঠি। কিছুক্ষণের মধ্যে লিফট চলে আসে পাঁচ তলায়। আমি তিতলিদের দরোজার কলিং বেলে টিপ দেই। যেন দরোজা খোলার জন্য কেউ অপেক্ষায় ছিল। দরোজাটা খুলে যায়। এমন কখনো হয় নি। প্রতিদিন দরোজা খুলে তিতলিদের কাজের বুয়া। কিন্তু আজ দরোজা খুললো মিষ্টি চেহারার একটি মেয়ে। মেয়েটির বয়স হবে উনিশ-বিশ বছর। ওর চোখ দুটি টানা টানা, ভীষণ মায়াবী। কারো কারো এমন চোখ আছে, যে চোখের দিকে তাকিয়ে চট করে চোখ ফেরানো যায় না। এই মেয়েটির চোখও সেরকম।

‘কাকে চাচ্ছেন?’ মেয়েটির কণ্ঠে প্রশ্ন।

‘জ্বি, আমি তিতলির প্রাইভেট টিউটর।’

‘ওহ্, ভেতরে আসুন।’

মেয়েটি দরোজা থেকে সরে দাঁড়ায়। আমি ভেতরে যাই। তিতলির মার গলা ভেসে এলো বেডরুম থেকে,

‘কে এসেছে, রিপা?’

‘তিতলির টিচার, আন্টি।’

‘তাকে বসতে বল, আমি আসছি।’

আমি ড্রইং রুমের সোফায় বসলাম। মেয়েটিও ড্রইং রুমে এসে বসলো। আমি অবাক হলাম। অপরিচিত একজনের সামনে কোন মেয়ে বসে, তা জানা ছিল না। আমি সংকোচ বোধ করতে লাগলাম। মেয়েটি বললো,

'আমার নাম রিপা। তিতলি আমার কাজিন।'

'ওহ্, আচ্ছা।'

'আপনি কী খাবেন?'

'না, না। আমি এখন কিছু খাবো না। ধন্যবাদ।'

'আপনি ভিজে গেছেন। আপনাকে একটা তোয়ালে এনে দিচ্ছি, মাথার চুলগুলো মুছে ফেলুন।'

রিপা এমনভাবে কথা বললো যেন আমরা অনেকদিনের চেনা এবং ঘনিষ্টজন। ও উঠে চলে গেল এবং একটি তোয়ালে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এলো। ওর আন্তরিকতায় আমি লজ্জায় পড়ে গেলাম। রিপার কাছ থেকে তোয়ালে নিলাম। কিন্তু ওর সামনে মাথার চুল মুছতে ইচ্ছে করছে না। রিপা বললো,

'লজ্জা পাচ্ছেন? পুরুষ মানুষের অত লজ্জা থাকতে নেই। যে কাজটা করে ফেলা জরুরি, তা করে ফেলাই ভালো। আপনি মাথার চুল মুছুন, আমি দেখবো। শার্টটা মনে হচ্ছে ভিজে গেছে। শার্ট খুলে দিন, আমি আয়রন করে দিচ্ছি।'

আমি রিপার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ও বললো,

'আপনি আমার দিকে এভাবে তাকিয়ে রয়েছেন কেন? তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছুন।'

ওর কথায় বিব্রত হই। নিজের লজ্জা আড়াল করতেই তোয়ালে দিয়ে মাথার চুল মুছতে থাকি। বুঝতে পারছি, রিপা চটপটে ও ঠোঁটকাটা স্বভাবের। মাথার চুল মুছে তোয়ালেটি ওকে ফিরিয়ে দিই। ও বললো,

'শার্ট দেবেন না?'

‘না, না। শার্ট তেমন ভিজে নি।’
হি-হি-হি করে হেসে উঠে রিপা। যেন আমাকে বোকা বানিয়ে মজা পাচ্ছে। ও চলে গেল তোয়ালে নিয়ে। আমি তিতলির কোন সাড়া শব্দ পাচ্ছি না। এর আগে এমন হয়নি। তামান্না হোসাইন ড্রইং রুমে এলেন। বললেন,
‘তিতলিকে আজ পড়াতে হবে না। পাশের ফ্ল্যাটের মুমুর আজ জন্মদিন। তিতলি আছে ওদের বাসায়।’
‘ঠিক আছে, আমি তাহলে যাই।’
‘না, না। আপনি যাবেন না। এই অঝোর বৃষ্টিতে কীভাবে যাবেন? আপনি বসুন, রিপার সাথে কথা বলুন। আমি মুমুদের ফ্ল্যাট থেকে আসছি। আমি এলে আপনি যাবেন। আপনাকে বাসায় নামিয়ে দিয়ে আসবে ড্রাইভার।’
‘না, না। আমি যেত পারবো..।’
‘আপনি না খেয়ে যেতে পারবেন না। বসুন, আমি আসছি। বুয়া, টিচারকে চা-নাস্তা দাও।’
তামান্না হোসাইন আমার দিকে তাকালেন না। তিনি দরোজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। কাজের বুয়া এসে দরোজাটা লাগিয়ে দিল।
রিপা চলে এলো ড্রইং রুমে। সোফায় বসলো, আমার মুখোমুখি। আমি ইতস্তত বোধ করতে লাগলাম। রিপা জিজ্ঞেস করলো,
‘আপনার কি খারাপ লাগছে?’
‘না, না। খারাপ লাগবে কেন?’
‘কিন্তু, আপনি কেমন জড়সড় হয়ে বসে আছেন যে!’
‘জ্বি, মানে, ঠিক-ই তো আছি।’
রিপা হাসলো।

‘আপনার নাম আকাশ,তাইনা?’
‘হ্যাঁ। এটি আমার ডাক নাম।’
‘খুব সুন্দর নাম।’
‘ধন্যবাদ।’
এ সময় কাজের বুয়া চায়ের ট্রে নিয়ে এলো ড্রইং রুমে। সোফার সামনের টেবিলে ট্রে রেখে চলে গেল সে। ট্রে-তে চা, বিস্কুট ও মিষ্টি রয়েছে। আমি চায়ের কাপ তুলে নিলাম। রিপাও চায়ের কাপ নিল। বললো,
‘আপনি অনেকদিন যাবত একটা চাকরি খুঁজছেন, তাইনা?’
‘হ্যাঁ।’
‘চাকরি পেয়ে যাবেন।’
‘রসিকতা করছেন?’
‘না, সত্যিই পেয়ে যাবেন। ইচ্ছে করলে, এ মাসেই পেয়ে যেতে পারেন।’
‘কীভাবে? কোথায়? কে দেবে?’
‘উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? এতে উত্তেজিত হবার কিছু নেই।’
‘কী বলছেন, চাকরি পাবার খবরে উত্তেজিত হবো না!’
‘বুঝতে পারছি, চাকরিটা আপনার খুবই দরকার।’
‘হ্যাঁ, কিন্তু কে আমাকে চাকরি দেবেন?’
‘আমার বাবা দিতে পারেন।’
‘আপনার বাবা!’
‘হ্যাঁ, আমার বাবা অনেক বড় পদ মর্যাদার সরকারি কর্মকর্তা। তিনি ইচ্ছে করলে, আপনাকে যখন-তখন চাকরি দিতে পারেন।’
‘তিতলি মা বুঝি আপনার বাবাকে আমাকে একটা চাকুরি দেবার জন্য বলেছেন?’

‘সেরকমই।’
‘মানে?’
‘মানে হচ্ছে, আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে। তাই আমার সুপারিসে আপনার চাকরি হতে পারে।’
‘থ্যাংকস গড। থ্যাংকস আপনাকে। আ-মি, আমি আপনার এই সহযোগিতার কথা আজীবন মনে রাখবো।’
আমার কথায় রিপা খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো। ওর এই হাসির অর্থ খুঁজে পেলাম না। কিশোরী মেয়েরা অকারণে হাসে। কিন্তু রিপা কিশোরী নয়। রিপা হাসি থামিয়ে বললো,
‘কিন্তু আমার কথা আজীবন মনে রাখলেই হবে না, আমাকে আজীবন সঙ্গে রাখতে হবে।’
‘ঠিক, বুঝলাম না।’
‘আপনি কি বোকা? এই সহজ কথাটা কেন বুঝতে পারলেন না?
‘সহজ কথা?’
‘হ্যাঁ, খুব সহজ কথা।’
‘আপনি কি আমাকে এই সহজ কথাটি খুলে বলবেন?’
‘বলছি। আন্টি অর্থাৎ আমার খালামণি, আপনার সাথে আমাকে বিয়ে দিতে চান।’
‘বিয়ে!’
‘নয়তো কি! আপনার-আমার মধ্যে বিয়ে ছাড়া আর কি সম্পর্ক হতে পারে?’
রিপার কথায় আমি যেন আকাশ থেকে পড়ি। চাকুরির জন্য বিয়ে, নাকি বিয়ের জন্য চাকুরি? হঠাৎ জ্বলে উঠা আশার প্রদ্বীপ দপ করে নিভে যায়। রিপা আমার মুখের

দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। ওর হাসির মধ্যে কেমন আবিষ্টতাও আছে। আমি নিজেকে সামলে নিয়ে বলি,

'তার মানে আপনার আন্টি আমার জন্য চাকুরি এবং বিয়ে দুটোই ঠিক করেছেন?'

'ঠিক ধরেছেন। তবে বিয়ের ওপর নির্ভর করছে চাকুরি।'

রিপার কথায় কোন জড়তা নেই। ও যেন আমার সাথে কথা বলার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। ওর কথায় হতাশ হয়ে পড়ি। আনন্দটা মিইয়ে যায়। বলি,

'চাকুরির জন্য আমি বিয়ে করবো কেন? আপনিই বা আমাকে বিয়ে করবেন কেন?'

'আপনি আমাকে বিয়ে করবেন, কি করবেন না, তা আপনার ব্যাপার। কিন্তু আমার অবলম্বন দরকার।'

'অবলম্বন!'

'হ্যাঁ, আমাকে নিয়ে আমার বাবা-মা'র অনেক টেনশন। তারা একজন সৎ ও চরিত্রবান পাত্রের হাতে আমাকে তুলে দিতে চান। তাই, আপনাকে ভালো চাকুরি দিয়ে আমাকে বিয়ে দিতে চাইছেন'।

'কিন্তু..!'

'চাইলে আপনি অনেক টাকাও নিতে পারেন। আমার বাবার অনেক অর্থ-বিত্ত! তিনি তার একমাত্র মেয়ের সুখের জন্য সব বিলাতে পারেন। আপনি এই সুযোগটা নিতে পারেন।'

'আপনি আমাকে প্রলুব্ধ করছেন, নাকি পরীক্ষা করছেন?'

'প্রলুব্ধ হলেও আপনাকে অপরাধী করবো না। আপনার সাথে বিয়ে হলে আমি খুশিই হবো।'

'কেন?'

'আপনাকে আমার ভালো লেগেছে।'

‘এত অল্পতেই ভালো লাগার অভ্যাস ভালো নয়। এতে ঠকে যাবার সুযোগ থাকে।’
‘অনেক হিসাব করেও মানুষ ঠকে। আমিও ঠকেছি।’
‘যেমন?’
‘আমি অনেকদিন জানা-শোনার পর একজনকে ভালোবেসে ছিলাম।’
‘তারপর?’
‘বাবা-মা’র অমতে ওকে বিয়েও করেছিলাম।’
‘বিয়ে!’
‘হ্যাঁ। কিন্তু দুভার্গ্য আমার। বিয়ের পরপরই জানতে পারলাম ও মাদকাসক্ত। অনেক চেষ্টা করেও ওকে ফেরাতে পারি নি।’
‘আচ্ছা! থামলেন কেন, বলুন?’
‘নেশাগ্রস্থ স্বামীর অনেক নির্যাতন সহ্য করেছি। এক পর্যায়ে ফিরে আসতে হয়েছে আমাকে। ডিভোর্সের মধ্য দিয়ে আমার ভুলের সমাপ্তি। অনেক দিনের চেনা লোককেও তো চিনতে পারি নি!’
রিপা মাথা নিচু করে ফেললো। হয়তো কাঁদছে বা কান্না চেপে রাখার চেষ্টা করছে। এই মুহুর্তে রিপার জন্য মনটা বিষণ্ন হয়ে গেল। কত সহজভাবে রিপা ওর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ও বেদনা-বিধুর ঘটনার কথা অকপটে বলে ফেললো। ওর মধ্যে চতুরতা নেই। বরং মনের সরলতা প্রকাশে ও দ্বিধাহীন। আমি চটপটে ও চঞ্চল রিপার মধ্যে দেখতে পেলাম নিঃসঙ্গ এক রিপাকে। ওকে সান্তনা দেবার জন্য বললাম,
‘রিপা, আপনার ব্যক্তিগত বেদনার কথা শুনে আমিও ব্যথিত।’
‘সরি, আপনাকে ওসব কথা শুনতে হলো বলে।’
‘আপনার প্রতি আমার সহমর্মিতা সবসময় থাকবে। আমি চাই, আপনি নতুনভাবে জেগে উঠবেন। নিজের মত করে সাজাবেন আপনার আগামী দিনগুলো।’

রিপা মুখ তুলে তাকালো। ঠোঁট কামড়ে ধরে আছে। কষ্ট চেপে রাখার চেষ্টা কিনা, কে জানে। ও বললো,
‘খালামণি আপনাকে খুব পছন্দ করেন। তিনি ইচ্ছে করেই আজ আমাকে আপনার সাথে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন। তার ধারনা, আপনি আমাকে বিয়ে করতে রাজী হবেন।’
‘আপনাকে বিয়ে করতে অনেকে রাজী হবে।’
‘আমার আগের বিয়ের কথা গোপন রেখে আন্টি আমার বিয়ে দিতে চাচ্ছেন। কিন্তু আমি চাই আমার সব সত্য জেনে ও মেনে আমাকে কেউ বিয়ে করুক।’
‘আপনার এই সিদ্ধান্তকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। সত্যকে অবলম্বন করে পথ চলাটাই ঠিক বলে আমি মনে করি। এতে কখনো কখনো হারানোর কষ্ট থাকলেও প্রবঞ্চনার গ্লানি থাকে না।’
‘আপনাকে ধন্যবাদ, সাহস দেবার জন্য। আপনাকে কি আরেক কাপ চা দেবো?’
‘না। আমি বরং এখন যাবো।’
‘সে-কী! আন্টি বলেছেন, আপনি আজ রাতে এখানে খাবেন।’
‘তাকে বলবেন, অন্য একদিন খাবো। সন্ধ্যায় আমার জরুরি একটা কাজ আছে।’
‘আপনি কি আমার ওপর রাগ করে চলে যাচ্ছেন?’
‘না। বরং আপনার প্রতি এক ধরনের ভালো লাগার রেশ নিয়ে যাচ্ছি।’
রিপা এবার লজ্জা পেল। কাজল দিঘির মত চোখ দুটোতে খুশির দ্যুতি ঝিলিক দিয়ে উঠলো। কখনো কখনো একটি মাত্র মিষ্টি কথায় মেয়েরা কেমন কিশোরী হয়ে যায়!

গুলশানের গোল চত্বর এলাকায় খুব সহজে খুঁজে পেলাম ‘ধানসিঁড়ি’ রেষ্টুরেন্টটি। মিতা আমাকে এই রেষ্টুরেন্টে অপেক্ষা করতে বলেছে। দুপুরে আমরা দু’জন লাঞ্চ করবো। কাল টেলিফোনে মিতার সাথে কথা হয়েছে। ও জানিয়েছে আমার জন্য একটা সুখবর আছে। আমার সুখবর মানে চাকুরি পাবার কোন সম্ভাবনা। মিতা আমার চাকুরির জন্য খুব চেষ্টা করছে। আমার প্রতি ও ভীষণ আন্তরিক। ওর আন্তরিকতায় আমি আপ্লুত। মিতাকে টেলিফোনে রিপা’র কথাও জানিয়েছি। রিপার কথা শুনে মিতা খুব হেসেছে। সিমির কথা ওকে এখনো বলি নি। বলার প্রয়োজন বোধ করিনি। আমার বর্তমান সময়ে সিমি ও রিপা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। সিমির কথা আমাকে ভাবায়। কখনো কখনো মন খারাপ হয়ে যায়। আগে এমন হয়নি। আমি নিজেই অবাক হই নিজের পরিবর্তনে। কিন্তু সিমিকে ফোন করি না। ফোন করার কথা মনে হলে ওর দেয়া অপমানের কষ্টটা জেগে উঠে। আনিসকে বিয়ে করে ও সুখী হোক-এই ভেবে নিজেকে সংযত রাখি। মাঝেমাঝে চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। রিপার কথা মনে হলে ওকে করুনা করতে ইচ্ছে করে। ওর জীবনের বেদনা বিধুর অধ্যায় আমাকে বিষন্ন করে দেয়। ভাবায়। কিন্তু বিয়ের বিনিময়ে চাকুরির প্রস্তাবটি আমাকে গ্লানিতে ডুবিয়ে দেয়। নিজের অসহায়ত্ব নিজেকে লজ্জা দেয়। এরপর থেকে তিতলিদের বাসায় আমার যেতে ইচ্ছে করে না। তিতলি’র মায়ের সামনে কেমন বিব্রতবোধ করি। এখন তিতলিকে মনযোগ দিয়ে পড়াতে পারছি না। এক ধরনের অস্বস্থি লাগে। ধানসিঁড়ি রেষ্টুরেন্টে বসে সিমি ও রিমি কথা ভাবতে লাগলাম। ওদের কথা ভাবতে ভাবতে ওদের দু’জনের মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য খুঁজে বের করলাম। সিমি জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আবেগ সংযত রেখেছে। অর্থাৎ বিয়ের সিদ্ধান্তে আবেগকে প্রশ্রয় দেয় নি। প্রভাব, প্রতিপত্তি আর বিত্তবান স্বামী বেছে নিতে ও ভুল করে নি। অপরদিকে রিপা আবেগকেই গুরুত্ব

দিয়ে বিয়ে করেছিল ভালোবাসার মানুষকে। রিপা ঠকেছে। সিমি হয়তো ঠকবে না। কিংবা ঠকলেও মানিয়ে নিতে পারবে ও। কিন্তু রিপা পারে নি। এখন নতুন করে জীবন সাজাতে চাইছে। বিত্তবানদের নতুন করে সাজিয়ে নেবার সুযোগ ও প্রবণতা দু'টোই আছে। তবে আমার প্রতি রিপা খানিকটা আবেগও জন্মেছে। ও বলছিল, আপনাকে আমার ভালো লেগেছে। ভালো লাগাটা কত সহজেই হয়ে যেতে পারে। বছরের পর বছর পাশে থেকেও ভালো লাগার মানুষ হওয়া যায় না। আবার ক্ষণিকের পরিচয়ে কেউবা ভালোবাসার মানুষ হয়ে যায়। আমার ভাবনা ভেঙ্গে দিল মিতার কণ্ঠস্বর।

'সরি, একটু দেরী হয়ে গেল।'

মিতা এসে বসলো আমার মুখোমুখি। আমার দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসলো। যেন দেরী করে অনেক অপরাধ করে ফেলেছে। আমি কপট রাগ দেখিয়ে বললাম,

'একটু নয়, প্রায় ৩০ মিনিট। বেয়ারা কয়েকবার এসে জানতে চেয়েছে কী খাবো।'

'ঠিক আছে, আমরা এখন খাবারের অর্ডার দিচ্ছি।'

বেহারাকে ডাকতে হলো না। যেন আশেপাশেই ছিল। বেহারা খাবার মেন্যুর বই বাড়িয়ে দিল আমার ও মিতার সামনে। মিতা বললো,

'কী খাবি, বল।'

'আমার কোন চয়েজ নেই। তুই অর্ডার দে।'

মিতা বিভিন্ন রকমের খাবারের অর্ডার দিল। বেহারা চলে যেতেই মিতা বললো,

'আমরা অনেকক্ষণ বসে আড্ডা দেব।'

'তার আগে আমার সুখবরটা বল।'

'অতো অধীর হচ্ছিস কেন? আগে তোর রিপা'র কথা শুনি।'

'রিপার কোন গল্প নেই।'

‘কেন?’
‘আরে বাবা, ওর সাথে কথা হয়েছে একদিন। ও টেলিফোন নম্বর দিয়েছিল। আমি ফোন করিনি।’
‘আহা, অমন ধনীর নিঃসঙ্গ দুলালীকে অবহেলা!’
‘মিতা, তুই যে কী বলিস!’
‘তা রিপার আন্টি তোকে কিছু বলে নি?’
‘বলেছেন। তিনি আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, রিপাকে আমি বিয়ে করবো কিনা?’
‘তাই! তুই কী বলেছিস?’
‘বললাম, আমাকে সময় দিন। ভেবে জানাবো।’
‘সময় নিলি কেন?’
‘বাহ্, যদি মুখের ওপর বলে দেই বিয়ে করবো না, টিউশুনিটা থাকবে? ওটাই তো এখন আমার সম্বল।’
মিতা হিহি করে হাসতে লাগলো। আমি ওর হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম,
‘তুই হাসছিস কেন?’
‘তুই একটু চালাক হয়েছিস, তাই হাসলাম। আচ্ছা, এখন বল, রিপার আন্টি অর্থাৎ তিতলির মা কি তোকে বলেছেন যে, রিপার বিয়ে হয়েছিল?’
‘না। এর বেশি কথা হয় নি। তিনি বিয়ের কথা তুলতেই বলে দিলাম ভেবে জানাবো। তিনিও এ ব্যাপারে আর কিছু বলেন নি। হয়তো আমার জবাবে খানিকটা মনক্ষুন্ন হয়েছেন।’
‘তা এখন চাকুরিটা হারালে কী করবি?’

‘সেটাই তো ভাবছি।’

বেহারা এসে টেবিলে খাবার সাজাতে লাগলো। আমার ক্ষুধাটা যেন আরো জানান দিচ্ছে। খাবারের সৌরভ ভেসে আসছে। ভাত, মুরগীর মাংশ, মাছ, ডাল, সব্জি, সালাত থরে থরে সাজানো হলো টেবিলে। বেয়ারা চলে যেতেই আমরা খেতে লাগলাম। মিতা বললো,

‘তোর কথা এক শিল্পপতিকে বলেছিলাম। তোকে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে বলেছেন। তুই আগামী রোববার সকাল ১০টায় তার অফিসে যাবি।’

‘তিনি কে? কোথায় যাবো?’

‘তার ভিজিটিং কার্ড দিচ্ছি। তার নাম মাহমুদ হাসান। একটি বহুজাতিক কোম্পানীর চেয়ারম্যান। আশা করছি, তোর একটা চাকুরি হয়ে যাবে।’

‘বলিস কি!’

‘অতো অবাক হচ্ছিস কেন?’

‘অবাক হবো না? গত তিন বছর ধরেই তো চাকুরি খুঁজছি। ইন্টারভিও কম দিলাম না। অভিজ্ঞতা যা হয়েছে, তাতে চাকুরি পাবো বলে বিশ্বাস হয় না। আর এখন তুই বলছিস, চাকুরি হয়ে যাবো।’

‘চাকুরি পাওয়া অনেক কঠিন ব্যাপার ঠিক, আবার কেউ কেউ খুব সহজেই পেয়ে যায়। তাই না?’

‘হ্যাঁ, হয় টাকা, নয় কারো প্রভাব লাগে।’

‘তা ধরে নে, আমার প্রভাবে তোর চাকুরি হচ্ছে।’

‘তোর আবার প্রভাব আছে!’

‘কেন, শুধু পুরুষ মানুষেরই প্রভাব থাকে? মহিলাদের থাকতে পারে না?’

‘তা পারে..।’

‘কোন কোন মহিলার প্রভাব অনেক বেশি হয়। আমিও সেরকম এক মহিলা।’
বলেই মিতা হি হি করে হাসতে লাগলো। আমি বলি,
‘কিন্তু..’
‘কোন কিন্তু নয়, রোববার সকালে তুই যাবি। তোর কথা বলে রেখেছি।
‘অবশ্যই যাবো। একটা চাকুরি আমার খুব দরকার।’
‘চাকুরি পেয়ে গেলে কী করবি?’
‘পাগল হয়ে যাবো।’
এ কথা বলে আমি হাসতে লাগলাম। মিতাও হাসলো। মনে মনে ভাবতে লাগলাম মফস্বলের একটি মেয়ে ঢাকায় এসে কীভাবে প্রভাবশালী রমণী হয়ে গেল! ঢাকা শহরে অনেক কিছু বদলে যায়,বদলে দেয় অনেককে।

১১

ফ্যান্টাসী কিংডমের সামনে এসে আমি খুব অবাক হলাম। শুনেছিলাম বিশাল জায়গা জুড়ে বেসরকারী উদ্যোগে ফ্যান্টাসী কিংডম তৈরি করা হয়েছে। এখানে বিনোদন প্রিয় শিশু-কিশোর ও চিত্তবিলাসী মানুষের ভিড় লেগেই থাকে। শিশুদেও জন্য এই পার্কটি ধনী ও মধ্যবিত্ত পরিবারের কাছে বিনোদনের একটি প্রিয় স্থানে পরিণত হয়েছে। আমি কখনো ফ্যান্টাসী কিংডমে আসিনি। আজ অসতে হলো। আজ তিতলিকে পড়াতে গিয়েছিলম। তামান্না হোসাইন বললেন,
‘আজ তিতলির জন্মদিন। আজ ওকে পড়াতে হবে না। আমরা তিতলিকে ফ্যান্টাসী কিংডমে নিয়ে যাবো।’
তিনি আমাকে চলে যেতে দিলেন না। বললেন,
‘আকাশ, আপনিও আমাদের সাথে যাবেন।’
‘আমি না গেলে হয় না?’

'না, আপনাকে যেতে হবে। তিতলি আপনাকে ছাড়া যাবে না। আপনার কি খুব অসুবিধা হবে?'

'না, না। অসুবিধা কিসের?'

'তাহলে চলুন।'

তিতলি ও ওর মা তৈরিই ছিল। তামান্না হোসাইন ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বললেন। নিউ ইস্কটন থেকে এক ঘন্টার মধ্যে ফ্যান্টাসী কিংডমে পৌঁছে গেলাম আমরা। পার্কটির প্রবেশ পথে এসে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বিশাল গেট। সু-সজ্জিত দোকান। মানুষের ভিড়, কোলাহল। চারপাশে দৃষ্টি রেখে হাঁটতে লাগলাম। পার্কে প্রবেশ করার টিকেট কাটলেন তামান্না হোসাইন। আমরা লাইন ধরে পার্কের ভেতরে প্রবেশ করলাম। ভেতরে আরো জমজমাট। যেন আনন্দ-উচ্ছ্বাসের ফোয়ারা। দেয়াল জুড়ে দৃষ্টি নন্দন কার্টুন। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের আনন্দের হট্টগোল। গেট দিয়ে প্রবেশ করে তিতলির মা এক পাশে থামলেন। আমি তার পাশে দাঁড়ালাম। তিনি এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাউকে খুঁজতে লাগলেন। অন্য পাশ থেকে হাস্যোজ্জ্বল মুখে এগিয়ে এলো রিপা। রিপাকে দেখে প্রথম কয়েক মুহূর্তের জন্য অবাক হলাম। বুঝতে পারলাম রিপা আশে পাশে অপেক্ষা করছিল। রিপা লাইট মেরুন রঙের একটি জামদানী শাড়ি পড়েছে। শাড়ির পাড়ে হস্তশিল্পের কারুকাজ। শাড়িতে রিপাকে সুন্দর লাগছে। খোঁপায় একগুচ্ছ হাসনা হেনা। মুখ মন্ডলে প্রসাধনের প্রলেপ নেই। সাধারণ সাজের অসাধারণ দ্যুতি। ও কাছে আসতেই হাসনা হেনার গন্ধ পেলাম। কৈশোর উত্তীর্ণ মেয়েরা বিশেষ সময়ে বা অনুষ্ঠানে শাড়ি পড়ে। রিপার শাড়ি পড়ার মধ্যেও একটা বিশেষ কারণ আছে-এটা বুঝতে কোন অসুবিধা রইলো না। রিপা আমাদের সামনে এসে

দাঁড়ালো। ওর সাথে আবার দেখা হবে, ভাবিনি। রিপাকে দেখে তামান্না হোসাইন বললেন,
‘তুই কি অনেকক্ষণ যাবত অপেক্ষা করছিলি?’
‘হ্যাঁ, আন্টি। প্রায় আধা ঘন্টা।’
‘ঠিক আছে, চল, সামনে যাই।’
রিপা আমাকে বললো,
‘কেমন আছেন?’
‘ভালো। আপনি?’
‘এখন ভালো আছি। কিছুক্ষণ আগেও মনটা খারাপ ছিল।’
রিপা হাসলো। যেন ওর হাসির মধ্যে কিছু কথা আছে। আমি বুঝতে পারলাম, তামান্না হোসাইন আমাকে ফ্যান্টাসী কিংডমে কেন নিয়ে এসেছেন। তিতলির জন্মদিনকে উপলক্ষ করে তিনি আমার সাথে রিপার দেখা করিয়ে দিলেন ভিন্ন এক পরিবেশে। তামান্না হোসাইন ও রিপা তিতলির হাত ধরে হাঁটতে লাগলো। তিতলি থেমে থেমে বায়না ধরতে লাগলো পার্কের বিভিন্ন ইভেন্টে অংশ নেবার জন্য। আমি নিঃশব্দে তাদের পেছনে হাঁটতে লাগলাম। হঠাৎ তামান্না হোসাইন দাঁড়ালেন। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। রিপাও দাঁড়ালো। তামান্না হোসাইন বললেন,
‘তোরা দু’জন ঘুরে বেড়া। আমি তিতলিকে নিয়ে ঘুরছি।’
‘কেন? আপনি কেন কষ্ট করবেন?’
আমি ককিয়ে উঠি। তিনি বলেন,
‘আমার কোন কষ্ট হবে না। তাছাড়া তিতলিকে নিয়ে আমিও কিছু রাইডে চড়বো।’
‘কিন্তু..?’

‘কোন কিন্তু নয়। আপনি রিপাকে নিয়ে ঘুরুন। রিপা, দু’ ঘণ্টা পর তুই আমার মোবাইলে ফোন দিয়ে মিট করবি, কেমন?’
‘আচ্ছা, আন্টি।’
তামান্না হোসাইন আমাকে আর কিছু বললেন না বা আমাকে বলার কিছু সুযোগ দিলেন না। তিনি তিতলিকে নিয়ে হনহন করে হেঁটে চলে গেলেন। রিপা আমার দিকে তাকিয়ে বললো,
‘আপনি কি রাগ করেছেন?’
‘রাগ করলেই বা কি হবে?’
‘রাগ করলে আমারও খারাপ লাগবে। আফটার অল, আমার জন্য ..!’
‘না, রাগ করি নি। তবে..?’
‘তবে কি?’
‘আপনার সাথে দেখা করিয়ে দেবার জন্যই তো আমাকে আপনার আন্টি নিয়ে এসেছেন, তাইনা?’
‘হ্যাঁ।’
‘আমার এই উদ্দেশ্যটাই ভালো লাগছে না।’
‘আই এ্যাম সরি, আকাশ। এর জন্য আমি দায়ী। আমিই আন্টিকে অনুরোধ করেছি আপনাকে এখানে নিয়ে আসতে।’
রিপা বিনীত হলো। অপরাধীর মত মাথা নিচু করে ফেললো। আমার ওর জন্য মায়া হলো। আমি বললাম,
‘ঠিক আছে, এখন চলুন ঘুরে বেড়াই।’
‘আপনার রাগ কমেছে?’
‘বলেছি তো রাগ করে নি। চলুন।’

রিপা মিষ্টি করে হাসলো। ওর মিষ্টি হাসির দিকে তাকিয়ে মনে হলো এই মেয়েটি জীবনে প্রবঞ্চিত হলো কেন? যে এতো সুন্দর করে হাসতে পারে, তার ভূবনটা বিপর্যস্ত হয়ে গেছে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। আমরা দু'জন পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম। রিপা কিছুক্ষণ পর বললো,

'আকাশ, আপনার কি খারাপ লাগছে?'

'না। এ কথা কেন বলছেন?'

'আপনি কিছু বলছেন না যে! কেমন গম্ভীর হয়ে আছেন।'

'কী বলবো, বলুন। আপনাকে বলা যায় আমার তেমন কোন কথা যে নেই।'

'একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করবো?'

'করুন।'

'আপনি কাউকে ভালোবাসেন?'

'ভালোবাসার জন্য সময় কোথায়? চাকরি খুঁজে খুঁজেই তো সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে।'

এ কথায় রিপা খুব হাসলো। যেন খুব হাসির কথা বলে ফেলেছি। বললো,

'সময়ের অভাবে কেউ ভালোবাসে না-এমন কথা শুনিনি। তা সময় পেলে ভালোবাসবেন-এমনকি কেউ আছে?'

বুঝতে পারলাম রিপা কথা বাড়াবে। কথায় কথায় ও জেনে নিতে চায় আমার কথা। বললাম,

'সময় বুঝে, পঞ্জিকা দেখে বা হিসেব করে ও মানুষ খুঁজে ভালোবাসা হয় না। তাছাড়া ভালোবাসলেই তো হয় না। যাকে ভালোবাসবো, তার ভালোবাসাও পেতে হবে। তবেই এর স্বার্থকতা। আবার না পাবার ভালোবাসা বা পেয়ে হারানোর ভালোবাসাও আছে। আমার কী আছে, কে জানে!

'না পাবার ভালোবাসা বা পেয়ে হারানোর ভালোবাসা কি?'

‘যেমন ধরুন, কেউ একজনকে ভালোবাসলো, কিন্তু সে ভালোবাসার মানুষের ভালোবাসা পেল না। এটা হচ্ছে না পাবার ভালোবাবাসা। আবার দু’জনে দু’জনকে ভালোবাসলো, কিন্তু কোন পরিণতি লাভ করলো না। আপনার কথাই ধরুন, যাকে ভালোবাসলেন, তাকে পেয়েও হারালেন। এটা হচ্ছে, পেয়ে হারানোর ভালোবাসা’।
‘ভালোবাসা সম্পর্কে দেখছি আপনার যথেষ্ট ধারণা আছে!’

‘আসলে ভালোবাসায় অনেক হুজ্জুত, অনেক কষ্ট। তাই কষ্ট বিলাসীরা প্রেমে পড়ে সহজে। আমি সে দলের নই।’
‘আপনি তাহলে কোন দলের?’
রিপার কৌতুহলী চোখ আমার দিকে নিবিষ্ট।
‘আমি আমার দলের। কেউ বলে আমি পরাজিত দলের।’
‘যদি আপনাকে কেউ এখন ভালোবাসে?’
‘সে মরীচিকার পেছনে ছুটবে। সে যাক, এবার আপনার কথা বলুন।’
আমি প্রসঙ্গ পাল্টাতে চেষ্টা করি। রিপা ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,
‘আমার উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গের কথা তো আপনি জানেন। নতুন কিছু নেই। বলার মত কিছু ঘটবে বলেও মনে হচ্ছে না।’
‘হতাশ হয়ে গেলেন?’
‘না, হতাশ হাই নি। শুধু স্বপ্নের দরোজাটা বন্ধ করে দিলাম।’
রিপার কণ্ঠ ভারি মনে হলো। ও হঠাৎ মিইয়ে গেছে। আমার কথাগুলো হয়তো ওকে আশাহত করেছে। সেটাই ভালো। মিথ্যে স্বপ্নের চেয়ে অপ্রিয় সত্য ভালো। আমি ওর মনের ভার হালকা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। মেয়েরা আইসক্রীম বা চটপতি খেতে পছন্দ করে। আমি বললাম,

‘চলুন, আইসক্রীম খাই।’
রিপা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। এই মুহূর্তে রিপার মধ্যে কোন উচ্ছ্বাস নেই। এক ধরনের গুমোট বিষণ্নতা দেখতে পাচ্ছি। আমরা একটি ফার্স্টফুডের দোকানে গিয়ে দাঁড়ালাম। আইসক্রীমের অর্ডার দিতে যাবো, এমনি সময় পেছন দিক থেকে আনিসের ডাক এলো,
‘আকাশ, আমাদের জন্যও দু’টো আইসক্রীম নিস্।’
অনিসের কণ্ঠে চমকে উঠি। পেছনে ঘুরে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। আনিসের সাথে সিমিও দাঁড়িয়ে আছে। আমার মুখটা কেমন হয়ে আছে, কে জানে। আমি কয়েকটা মুহূর্ত থ হয়ে রইলাম। আমার ভেতরে কষ্টের ভীষণ তোলপাড় শুরু হলো। সিমি কিছু বললো না। ও আমার চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। যেন আমার ভেতরের সব পড়ে নিচ্ছে। মুহূর্তগুলো যেন আটকে আছে আমার অবাক চোখের তারায়। আনিস বললো,
‘ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিস, মনে হচ্ছে?’
‘না, ঠিক তা নয়। তোরা এখানে!’
‘বিয়ের আগে হবু কনের সাথে একটু ঘুরে নিচ্ছি। বলতে পারিস, আলোপ-আলোচনা করে নিচ্ছি। তা তুই এখানে কেন? তাকে তো চিনলাম না?’
রিপার দিকে ইঙ্গিত করে প্রশ্নটি করলো আনিস। আমি রিপাকে পরিচয় করিয়ে দিতে বলি,
‘ওর নাম রিপা। আমার পরিচিতা। আর রিপা, ও হচ্ছে আমার বন্ধু আনিস। আর ওর নাম সিমি। ওদের অচিরেই বিয়ে হচ্ছে।’
রিপা সালাম জানালো আনিস ও সিমিকে। সিমি রিপাকে বললো,
‘আপনি খুউব সুন্দর, রিপা।’

এ কথায় রিপা লজ্জায় লাল হয়ে গেল। সিমি কথাটি রিপাকে খুশি করার জন্য যে বলে নি, তা আমি বুঝতে পারলাম। কথাটি যেন আমার উদ্দেশেই বলা। আনিস বললো,

‘তা আকাশ, রিপার কথা তো তুই আগে বলিস নি! এমন সুন্দরী পরিচিতাকে লুকিয়ে রেখেছিলি কেন?’

‘আমি লুকিয়ে রাখিনি। ও নিজেই লুকিয়ে ছিল।’

রিপা বললো,

‘আমাদের মধ্যে লুকোলুকির কিছু নেই। আমরা..’

আমি রিপার কথা কেড়ে নিয়ে বললাম,

‘আমরা একে-অন্যের কাছে স্পষ্ট এবং বিশ্বস্থ।’

আমার এ কথায় সিমির চোখ দু’টি যেন জ্বলে উঠলো। ও বললো,

‘যাক, তুমি এখন নিজেকে স্পষ্ট করতে শিখেছো?’

‘আমি বরাবরই স্পষ্ট। তোমরা অনেকে অহেতুক আমাকে দুবোর্ধ্য ভাবো।’

সিমি কিছু বলতে যাচ্ছিলো। আনিস ওকে হাতের ইশারায় থামিয়ে বললো,

‘এখানে দাঁড়িয়ে শুধু তর্ক করলে হবে? রিপাই বা কি ভাববে? চলো, সবাই আইসক্রীম খাই।’

আনিসের প্রস্তাবে সায় দিল রিপা। আনিস এগিয়ে গেল আইসক্রীম কিনতে। আমি ও সিমি নিঃশ্চুপ। নীরবতারও একটা ভাষা আছে। এ ভাষা সেতুবন্ধন তৈরি করলো আমার ও সিমির মধ্যে। আমার দু’ পাশে সিমি ও রিপা। খুব ইচ্ছে হলো সিমির হাতটি ধরে বলি, ‘তুমি আনিসকে বিয়ে করো না!’ কিন্তু আমার ও সিমির মাঝে অদৃশ্য এক দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে। এই দেয়ালটা ভাঙ্গতে পারছি না। সুপ্ত ইচ্ছেটা দেয়ালে হোচট খেয়ে গুমরে কাঁদতে লাগলো।

রিপা সিমিকে বললো,
‘আপনাদের কবে বিয়ে হচ্ছে?’
‘আর দু’ সপ্তাহ পর। ২২ সেপ্টম্বর। বিয়েতে আপনার নিমন্ত্রণ রইলো। আসবেন কিন্তু!’
‘চেষ্টা করবো।’
‘চেষ্টা নয়, আসতেই হবে। আকাশের সাথে চলে আসবেন। আসলে আমি খুব খুশি হবো।’
আমি সিমিকে বললাম,
‘তোমার বিয়েতে আমি আসবো কিনা তা তো আমাকে জিজ্ঞেস করলে না!’
দু’ চোখে বিস্ময় নিয়ে সিমি বললো,
‘তুমি কি আমার বিয়ে তে আসবে না!’
‘না-ও তো আসতে পারি।’
‘কেন?’
‘সব ‘কেন’র জবাব দেয়া যায় না। আর আমি জবাবদিহিতা করতে বাধ্য নই।’
‘আমার সাথেই তোমার যত অহংকার। অহংকার ছাড়া তোমার আর..’
‘কিছুই নেই। আমার কিছু নেই, তাতে আমার কোন দুঃখও নেই। না থাকারও একটা অহংকার আমার আছে।’
রিপা বিব্রতভাবে আমাকে ও সিমিকে দেখছে। সিমি বললো,
‘আরো কিছু বলবে?’
‘বিত্তের বেসাতি নিয়ে তোমাদের অনেক অহংকার। আমি চিত্তের বিলাসিতায় বিভোর। তোমাদের বৈষায়িক হিসেবকে আমি পায়ে দলে পথ চলতে পারি।

দারিদ্রতা নিয়ে আমার কোন লজ্জা নেই। মানুষকে মূল্য দিতে না পারার তোমাদের দীনতা দেখে, আমার আফসোস হয়।'

সিমি কোন কথা বললো না। ও আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো অপলক। কথাগুলো বলে আমি যেন ভার মুক্ত হলাম। চাপা ক্ষোভ বেরিয়ে এলো কথার মধ্যে। এরমধ্যে আনিস চলো এলো আইসক্রীম নিয়ে। বললো,

'চলো আইসক্রীম খেয়ে সবাই একসাথে ঘুরে বেড়াই।'

আনিস আইসক্রীম বাড়িয়ে দিল রিপার দিকে। রিপা আইসক্রীম নিল। সিমির দিকে আইসক্রীম বাড়াতেই সিমি বললো,

'আমি আইসক্রীম খাবো না। আমি এখুনি বাড়ি যাবো।'

বলেই ও হাঁটতে লাগলো গেটের দিকে। আনিস হতভম্ব হয়ে গেল। ও আমার দিকে তাকালো। আমি 'কিছুই হয় নি' ভাব করে রইলাম। কয়েকটা মূহূর্ত নষ্ট করলো আনিস। এরপর আনিস জোরে পা চালালো সিমির উদ্দেশ্যে। আমি আপন মনে হেসে উঠলাম।

১২

আজকের দিনটি আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন। এ দিনটি স্মরণীয় হবার জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। প্রথম কারণটি হচ্ছে আজ আমার চাকরি হয়েছে। আর দ্বিতীয় কারণটি হলো আজ সিমির বিয়ে হচ্ছে। দুটি ঘটনাই তীব্র আনন্দের।

কিন্তু কেন জানি, সিমির বিয়ের জন্য আমি কষ্ট পাচ্ছি। আনন্দ আর কষ্টের দুটি ধারা আমার মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে। চাকরি পাবার সীমাহীন আনন্দটা উপভোগ করতে পারছি না। নিজের ভেতর এক ধরনের মিহিন ভাঙ্গাচোরা টের পাচ্ছি। আমাকে অনেকে ‘কঠোর’, ‘আবেগহীন’, ‘আত্মকেন্দ্রিক’, ‘অহংকারী’ কতকিছু ভাবে। সিমি খেপে গেলে বলতো, ‘তুমি হৃদয়হীন, নির্দয়!’ অথচ আজ আমার ভেতরে এ কীসের জলপ্রপাত? এ কথা ভাবতেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করি। মাত্র কিছুক্ষণ আগে আমার চাকুরিটা হলো। আনন্দের চেয়ে বিস্ময়ের রেশ বেশি গভীর। আমি অবিষ্ট চিত্তে চাকুরির নিয়োগপত্র নিয়ে মতিঝিলের ব্যস্ড় ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছি। মাথার উপর দুপুরের সূর্য। গনগনে রোদ। আজ রোদের তীব্রতা গায়ে লাগছে না। এই মুহূর্তে একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আমি ধূমপান করি না। আশেপাশে তাকিয়ে দেখে নিলাম টেলিফোনের দোকান আছে কিনা। চাকুরির পাবার খবরটা প্রথমে জানাতে হবে মিতাকে। ওর জন্যই চাকুরিটা হলো। কোন ইন্টারভিউ নেই। শুধু কুশল বিনিময় করেই চাকরি পেয়ে গেলাম। মিতাকে আমার আলাদ্দিনের চেরাগ মনে হচ্ছে।

আমাকে চাকুরি দিলেন দেশের বিশিষ্ট শিল্পপতি মাহমুদ হাসান। তিনি একটি বহুজাতিক কোম্পানির চেয়ারম্যান। তিনি যখন তখন যে কাউকেই চাকুরি দিতে পারেন। এতে অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু আমি ভীষণ অবাক হয়েছি। প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না যে, তিনি আমাকে তাৎক্ষণিকভাবে চাকুরিতে নিয়োগ দিয়ে দেবেন। এই ৩০ মিনিট আগে তার বিশাল কক্ষে যখন গিয়েছিলাম, তখন আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। মাহমুদ হাসান ফাইল দেখায় মগ্ন ছিলেন। তিনি আমাকে ইশারায় তার সামনের চেয়ারে বসতে বললেন। আমি চেয়ারে বসলাম। বুক দুরু

দুরু কাঁপছিলো। মাহমুদ হাসান ফাইল থেকে চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,

‘আপনার কোয়ালিফিকেশন?’

‘জ্বি, ইকোনিমিক্সে অনার্স-মাস্টার্স। ফ্রম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।’

‘চাকুরির অভিজ্ঞতা নেই, তাই না?’

‘জ্বি। অনেকদিন যাবত বেকার।’

‘মিঃ আকাশ, আমি আপনাকে একটা সুযোগ দিতে পারি। আপনি আপনার যোগ্যতা প্রমাণ করে চাকরিটা রক্ষা করবেন বলে আশা রাখি।’

‘জ্বি, জ্বি। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করবো, স্যার।’

‘আমি অনেষ্টি, সিনসিনিয়ারিটি আর ডিসিপ্লিন পছন্দ করি। চাকুরির জন্য এই তিনটি গুণের খুবই প্রয়োজন, বুঝলেন?’

‘আমি এ কথা মনে রাখবো, স্যার।’

‘কক্সবাজারে আমাদের একটি মাছ প্রসেসিংয়ের ইন্ডাষ্ট্রি আছে। এই ইন্ডাষ্ট্রি থেকে বিভিন্ন দেশে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ মাছ রফতানি করা হয়। আপনাকে ঐ ইন্ডাষ্ট্রিতে এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসাবে আমি নিয়োগ দিচ্ছি। আপনি এক সপ্তাহের মধ্যে সেখানে জয়েন্ট করবেন। প্রথম তিন মাস আপনি ট্রেনিং পিরিয়ড হিসাবে কাজ করবেন। কাজ শিখবেনও। এই তিন মাস আপনি বেতন পাবেন ২২ হাজার ৫ শ’ টাকা। তিন মাস পর আপনার পারফমেন্স ভালো হলে চাকুরি স্থায়ী হবে। তখন আপনার বেতন হবে ৩০ হাজার টাকা। কোম্পানীর ডাকবাংলো এবং অফিসের গাড়ি আপনার জন্য বরাদ্দ থাকবে।’

মাহমুদ হাসানের কথাগুলো আমাকে এলোমেলো করে দিল। মনে হচ্ছিল কোন স্বপ্ন দৃশ্য। আমি কোন কথাই বলতে পারছিলাম না। তিনি বললেন,

‘আপনার কিছু বলার আছে?’
‘জ্বি, না স্যার। আমি..আমি..’
‘আপনি বাইরে গিয়ে আমাদের প্রধান ক্যাশিয়ারের সাথে দেখা করুন। তিনি আপনাকে এক মাসের বেতন অগ্রীম দিয়ে দেবেন। আমি টেলিফোনে বলে দিচ্ছি।’
তিনি টেলিফোনে তার সেক্রেটারিকে আমাকে অগ্রীম বেতন ও অস্থায়ী নিয়োগ পত্র দেবার কথা বললেন। আমার হৃৎকম্পন যেন বেড়ে গেল। আমার খুব তৃষ্ণা পেল। মাহমুদ হাসান টেলিফোন রেখে বললেন,
‘আমি আশা করছি আপনি এই চাকুরিটা এনজয় করবেন।’
‘জ্বি, স্যার। আমি . আমি. ।
‘আপনি একটু নাভার্স হয়ে গেছেন।’
‘জ্বি, স্যার। আমার নার্ভ কাজ করছে না।’
‘বি ইজি, ম্যান। আই কংগ্র্যাচুলেট ইউ টু ইউর ফার্স্ট জব।’
মাহমুদ হাসান উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম। তার সাথে হ্যান্ডস্যাক করে বললাম,
‘গ্রেট থ্যাংকস টু ইউর গ্রেট কাইন্ড, স্যার।’
‘ওয়েলকাম। ইন্ডাস্ট্রির স্বার্থে কাজ করবেন। যে কোন প্রয়োজনে আমাকে ফোন করতে দ্বিধা করবেন না।’
‘ইয়েস, স্যার। একটা কথা বলতে পারি, স্যার?’
‘বলুন।’
‘আমি আজই চলে যেতে চাই।’
‘নো প্রবলেম, আমার সেক্রেটারি কক্সবাজার ফোন করে দেবে।’
‘থ্যাংকস এগেইন, স্যার।’

মাত্র এই ক'টি কথার মধ্য দিয়ে ঈর্ষণীয় চাকরিটা পেয়ে গেলাম। আমার পকেটে এখন এক মাসের বেতনের টাকা এবং চাকরির নিয়োগ পত্র। মতিঝিলের সামনে দাঁড়িয়ে সামনের অট্টালিকাগুলোর দিকে চেয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। মনে হচ্ছিলো আমিও ঐ অট্টালিকার মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছি। আমি টেলিফোন করার জন্য একটি ফোন-ফ্যাক্সের দোকানে ঢুকে পড়লাম। ফোন করলাম মিতার মোবাইল ফোনে।

'হ্যালো..।'

'মিতা, আমি আকাশ বলছি।'

'আকাশ! কী খবর বল, চাকরি হয়েছে?'

'হ্যাঁ, তোকে কী বলে ধন্যবাদ দেব, ভেবে পাচ্ছি না।'

'হয়েছে, হয়েছে। তোর চাকরি পছন্দ হয়েছে?'

'হয়েছে। অনেক ভালো বেতন! আমার জন্য এই চাকরি স্বপ্নের মত!'

'বেতন পেলে আমাকে খাওয়াতে হবে কিন্তু!'

'কী যে বলিস! তুই কি এখুনি আসতে পারবি?'

'না, কেন?'

'আমি তো আজই চলে যাচ্ছি।'

'কোথায়!'

'কক্সবাজার। সেখানেই থাকতে হবে।'

'তা আজই যেতে হবে কেন?'

'আমিই চলে যাচ্ছি। এই শহর থেকে আজই চলে যেতে চাই।'

'এই শহরের প্রতি এতো রাগ কেন?'

'তোকে এ কথা অন্য একদিন বলবো। তুই সত্যিই আসতে পারবি না?

‘নারে। আমি আজ ব্যস্ড় থাকবো। ঠিক আছে, তুই চলে যা।’
‘তোর সাথে দেখা না করেই চলে যাবো?’
‘আমার জন্য তোর ভাবতে হবে না। তোকে তো সব সময়ের জন্য আমি পাবোও না!’
‘তাই বলে..?’
‘আমি কক্সবাজার গিয়ে তোর সাথে দেখা করে আসবো।’
‘তুই আসবি!’
‘আমাকে মাঝেমাঝে কক্সবাজার যেতে হয়। এ নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। তুই মনযোগ দিয়ে চাকুরি কর।’
‘তা করবো। এই চাকরি আমার জন্য বিরাট একটা চ্যালেঞ্জ।’
‘আমার বিশ্বাস, তোকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হবে না।’
‘তোর ঋণ কোনদিন শোধ করতে পারবো না, মিতা!’
‘পাগল ছেলে! তোকে ঋণ শোধ করার জন্য চাপ দিচ্ছে কে, শুনি?’
মিতার কণ্ঠও আবেগ-আপ্লুত। আমার দু’ চোখ ভিজে আসতে চায়। নিজেকে সামলে নেই। টেলিফোনের দোকানে কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলাটা সস্তা আবেগের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু এই মুহূর্ত আমার হাউমাউ করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কান্নার বেগ রোধ করতে আমি ফোনটা রেখে দিলাম। কষ্টের অবদমন কি সমসময় চেপে রাখা যায়? দু’ চোখ থেকে টপটপ করে গড়িয়ে পড়লো কয়েক ফোঁটা অশ্রু। এই অপ্রতিরোধ্য অশ্রুকণা চট করে মুছে ফেললাম রুমাল দিয়ে। বিল দিতে গিয়ে দেখি, ফোন-ফ্যাক্সের দোকানের মালিক আমার বিষণ্ন মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন।

১৩

ঢাকা শহরটা যেন একমাসেই বদলে গেছে। সেসাথে বদলে গেছে মানুষও। একমাস পর ঢাকায় ফিরে এ কথাই মনে হলো। সেই চেনা শহরটাকে কেমন অচেনা লাগছে। হেড অফিসের নোটিশে আমি একদিনের জন্য ঢাকায় এলাম। প্রক্রিয়াজাতকৃত সামুদ্রিক মাছ আমদানী করতে উৎসাহী একটি বিদেশী বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ঢাকায় এসেছেন। ঐ প্রতিষ্ঠানটির সাথে আমাদের কোম্পানির যৌথভাবে নতুন ইন্ডাস্ট্রি তৈরির কথা চলছে। আমাকে জরুরিভাবে আসতে হলো আমাদের কোম্পানিতে উৎপাদিত প্রক্রিয়াজাতকৃত মাছ নিয়ে। এই মাছ নমুনা হিসাবে দেখানো হবে বিনোয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের। রাতের বাস ধরে পৌঁছে গেলাম ঢাকা। রাত জাগা ভ্রমণের ক্লান্তি নিয়েও অফিসে থাকতে হলো দুপুর অব্দি। অফিসের কাজ শেষ হবার পর বিকেলটা হাতে ছিল বিশ্রামের জন্য। রাতেই আমাকে ছুটতে হবে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে। বিশ্রাম নিতে চাইলো না বিরহ কাতর মন। টানা একমাস না দেখা ঢাকা শহর আমাকে বিষন্ন করে দিল। মিতার কথ া মনে হতেই ওকে ফোন করলাম। ওকে ফোনে পেলাম না। সিমির কথা মনে হচ্ছিলো এক পশলা চাপা বেদনার রেশে। অন্য সময় হলে ওকে ফোন করে চমকে দিতাম। কিন্তু আজ ইচ্ছে করলো না। মনে মনে বললাম, ‘সিমি, আনিসকে নিয়ে সুখী হও’। মনে গুমোট ভাব পেখম ছড়িয়ে রইলো। নিজের মধ্যে এক ধরনের অস্বস্থি এবং কষ্ট টের পাই। সবচেয়ে বেশি অস্বস্থির মধ্যে পড়ি রিপার সাথে হঠাৎ দেখা হবার পর। রিপার আচরণে খুবই অবাক হই। ও যেন আমাকে চিনতেই পারছিল না। বিষন্ন বিকেলে নিউমার্কেটে

ঘুরছিলাম। তিতলিকে দেখতে পেলাম রিপার সাথে। তিতলিকে দেখে মনটা ভালো হয়ে গেল। একটি ফার্ষ্টপুডের দোকানের সামনে ওরা দাঁড়িয়েছিল। আমি কাছে গিয়ে তিতলিকে বললাম,

‘কেমন আছো, তিতলি?’

তিতলি ভীষণ চমকে গেল এবং খুশি হলো। ও অবাক চোখে বললো,

‘স্যা-র!’

‘হ্যাঁ, কেমন আছো?’

‘ভালো।’ তিতলি ছোট্ট করে জবাব দিল।

‘তুমি এখন কার কাছে পড়ছো?’

‘নতুন একজন স্যারের কাছে। তার নাম হাবিব।’

আড়চোখে দেখলাম রিপা আমাকে দেখে না চেনার ভান করছে। আমি অবাক হলাম। তিতলিকে বললাম,

‘তোমার মা আসেন নি?’

‘না, স্যার। আমি আপুর সাথে এসেছি। হাবিব স্যারও এসেছেন।’

‘তাই নাকি!’

এবার রিপা তিতলিকে ধমকে উঠলো।

‘তিতলি, এতো কথা বলছো কেন?’

তিতলি চুপসে গেল। আমি রিপার দিকে চেয়ে বললাম। আপনি কি আমার প্রতি কোন কারণে রেগে আছেন?’

‘আপনার প্রতি রাগ করবো কেন? রাগ করার কারণই বা কি থাকতে পারে?’

‘আমারও তাই ধারনা।’

‘আপনার কী ধারনা, তা নিয়ে ভাববার আমার সময় নেই।’

রিপার কণ্ঠে ঝাঁঝ। আমি বিব্রত হয়ে যাই। এ সময় ফার্স্টফুডের দোকান থেকে একজন সুদর্শন যুবক বের হয়ে এলেন তিনটি আইসক্রীম নিয়ে। রিপার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। যুবকটি রিপার কাছে আসতেই ও বললো,

'এতো দেরী করলে কেন? বাইরে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়? একা মেয়ে মানুষ দেখলে কত লোকের উপদ্রব সহ্য করতে হয়, জানো!'

রিপার বিদ্রুপটা যেন আমার উদ্দেশ্যে। সুদর্শন যুবক অনেকটা অপরাধী গলায় বললো,

'সরি, দোকানদার একশ' টাকার ভাংতি দিতে পারছিল না। তাই একটু দেরী হয়ে গেল।'

যুবক এবার আমার দিকে তাকালো। রিপা তার চোখ অনুসরণ করে বললো,

'হাবিব, তিনি নাকি তিতলিকে পড়াতেন। এখানে তিতলিকে দেখে কথা বলছেন।'

তিতলি বললো,

'স্যার, তিনি আমার আকাশ স্যার।' তিতলির কথা শুনে হাবিব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,

'ও আচ্ছা! আপনার কথা তিতলি প্রায়ই বলে। আমার নাম হাবিব। আপনি চলে যাবার পর আমি ওকে পড়াচ্ছি।'

তিতলি ও রিপাকে হাবিব একটি করে আইসক্রীম বাড়িয়ে দিল। নিজের হাতের আইসক্রীমটি হাবিব আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন,

'এটি আপনি ধরুন, আমি আরেকটি কিনে আনছি।'

কিছু লোক আছেন, যারা কোন ঘোরপ্যাঁচ বোঝেন না। সহজ এবং সরল। রহস্য, কপটতা বা সন্দেহ কোনটাই তাদের চরিত্রে দেখা যায় না। পৃথিবীতে প্রলয় হয়ে গেলেও তাদের ভ্রুক্ষেপ নেই। তারা নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত এবং যে কোন

পরিস্থিতিতে তারা নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন। তাদের সব সময় সুখী-সুখী মনে হয়। হাবিব এ ধরনের একজন লোক। খুব দ্রুত হাবিবের চরিত্র এঁকে ফেললাম। হাবিবকে বিয়ে করে রিপা সুখী হতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। এ ধরনের লোক পেছনে ফিরে তাকাতে চায় না। তাদের দৃষ্টি থাকে সামনের দিকে। রিপা এবার সঠিক লোক ধরেছে।

'কী হলো, ধরুন।'

হাবিবের অনুরোধে আমি বললাম,

'আপনাকে ধন্যবাদ। আমি আইসক্রীম খাই না। আপনার সাথে পরিচিত হয়ে ভালো লাগলো।'

রিপা হাবিবকে বললো,

'হাবিব, তাড়াতাড়ি চলো, সিনেমা দেখবো, মনে আছে তো?'

'হ্যাঁ, মনে আছে। আজ সিনেমা দেখবো আর রমনা রেস্তোঁরায় ডিনার খাবো।'

হাবিব আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনি আমাদের সাথে যাবেন?'

এ কথার জবাব দেবার আগেই রিপা বললো,

'তুমি যে কী! তিনি আমাদের সাথে কেন যাবেন! তার কাজ আছে না?'

রিপার এই উদ্বেগ প্রকাশে খারাপ লাগলো না। আমাকে রিপা উপেক্ষা করছে ঠিক, কিন্তু আমার উপস্থিতি ওকে স্বাভাবিক রাখবে কি? আমি রিপার কথা সমর্থন করে বললাম,

'আমার অনেক কাজ। সন্ধ্যায় আমাকে চলে যেতে হবে ঢাকার বাইরে।'

'ঠিক আছে, আপনার সাথে আরেকদিন কথা হবে। আমরা আসছি।'

'আচ্ছা, আসুন। দেখা হবে হয়তো।'

এ সময় রিপা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে হাবিবকে বললো,

‘হাবিব, তাকে আমাদের বিয়ের দাওয়াতটা দিয়ে দাও। তিতলির সাবেক টিচার হিসাবে তিনিও আমাদের বিয়েতে আসতে পারেন।’
দাওয়াত না দিয়ে যেন ভীষণ একটা ভুল হয়ে গেছে, এমন ভাব ফুটে উঠলো হাবিবের চোখে-মুখে। তিনি লজ্জিতকণ্ঠে বললেন,
‘এ মাসের ২৮ তারিখে আমাদের বিয়ে। ইস্কাটনে অফিসার্স ক্লাবে। আপনি আমন্ত্রিত। আসবেন কিন্তু!
‘চেষ্টা করবো আসতে। না আসতে পারলেও আপনাদের প্রতি আমার শুভ কামনা রইলো।’
রিপা তাড়া দিল,
‘চলো, দেরী হয়ে যাচ্ছে!’
হাবিব বললো,
‘আচ্ছা, আসি?’
‘আসুন।’
ওরা চলে গেল। আমি বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। ভাবতে লাগলাম, প্রত্যাখান কাউকে পাথর করে দেয়, আবার কাউকে তুষের আগুনে পোড়ায়। রিপা আজ আমার উপর চেপে রাখা আগুনের উত্তাপ ছড়িয়ে গেল। ওর জন্য খুব মায়া হলো। ও সংসারী হতে চায়, যে কাউকে নিয়েই সুখী হতে চায়। কেউ কেউ কত সহজেই মুছে ফেলে সব, কত সহজেই গ্রহণ করে!

সমুদ্রের যেমন নয়নাভিরাম সৌন্দর্য আছে, তেমনি আছে এর অদ্ভূত শক্তি। সমুদ্রের সামনে মানুষ তার দুঃখ,কষ্ট,হাহাকার,গ্লানি নিয়ে মন খারাপ করে থাকতে পারে না। সমুদ্র দুঃখ-কষ্ট শুষে নেয় বা তা ঘুম পাড়িয়ে রাখে। তাই সব হারানো মানুষও সমুদ্রের সামনে নিজের নিঃসঙ্গতা ভুলে যায়। ‘যে কোন বিশালত্বের সামনে কোন ক্ষুদ্রতার অস্থিত্ব টের পাওয়া যায় না’ এই সত্যটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছি কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে এসে। সমুদ্রের সাথে আমার প্রতিদিন সখ্যতা হয়। আমার সমস্ত কষ্টের ভার তুলে দিই সমুদ্রের কাছে। সমুদ্রও আমার গোপন দুঃখগুলো নিয়ে যেন খেলা করে। আজ সৈকতে সারাদিন কাটিয়ে দেব। সমুদ্রের সাথে আমি দিনভর ভাব বিনিময় করবো। আজ আমার ছুটি। একটানা তিনমাস কর্মজীবনের প্রথম ছুটি। এই তিন মাস শুধু কাজ করেছি। বেকারত্বের দিন হয় দীর্ঘ। কর্মজীবীর সময় ফুরিয়ে যায় দ্রুত। কাজের ব্যস্ততায় দ্রুত ফুরিয়ে গেল তিনটি মাস। এ তিন মাস ভুলে গিয়েছিলাম সবকিছু। কাজের চাপে তলিয়ে গিয়েছিলাম। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অফিস করেও থেমে থাকিনি। প্রয়োজনে কোনদিন মধ্যরাত অব্দি ইন্ডাষ্ট্রিতে শ্রমিকদের সাথে কাজ করেছি। কোম্পানীর স্বার্থে নিজেকে উজার করে দিয়েছি। নিজেকে দায়িত্ববান, যোগ্য ও কর্মঠ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার সব চেষ্টাই করেছি। ইন্ডাষ্ট্রির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে আমার মধুর সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। মনে হচ্ছে, আমরা সকলে একটি পরিবার। এমন সুন্দর চাকুরি পাবো আমি জীবনে স্বপ্নও দেখিনি। তাই কাজে নিজেকে উজার করে দিয়েছি। কঠোর পরিশ্রমের পুরস্কারও পেলাম। আজই আমার চাকুরি স্থায়ী হয়েছে। চাকুরির স্থায়ী নিয়োগ প্রাপ্তিতে আমার ভীষণ ভালো লাগছে। এমন একটি শুভদিনের অপেক্ষায় ছিলাম। তাই আজ ছুটি নিয়েছি। ইচ্ছে হলো সারাদিন সমুদ্র সৈকতে ঘুরে বেড়াবো। সমুদ্রের

সাথে অনুচ্চারিত শব্দে হবে আমার কথপোকথন। এই ভাবনায় চলে এলাম সৈকতে।

সৈকত জুড়ে চিত্ত বিলাসী মানুষের ভিড়। নারী-পুরুষ-শিশুদের কোলাহলে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে বাতাসের শো শো শব্দ আর সমুদ্রের গর্জন। জানুয়ারির আকাশ মেঘমুক্ত। নীল। নীলাকাশের ছায়ায় সমুদ্রও নীল। শীতের হালকা হিমেল হাওয়ায় উড়ছে গাঙচিল, ফের ঝুপ করে নামছে পানিতে। কক্সবাজার বীচে শীতের সময় অনেক ট্যুরিষ্ট আসেন। ভ্রমণ ও বিনোদন প্রিয় মানুষ সমুদ্র দর্শনের জন্য এ সময়টা বেছে নেন। কারণ, ছেলে-মেয়েদের স্কুল ছুটি যেমন থাকে, তেমনি ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ভয় থাকে না। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কক্সবাজার বীচ থাকে জমজমাট। আমি বসে আছি সমুদ্রের জলসীমার খুব কাছাকাছি। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম বড় বড় ঢেউগুলো কীভাবে ভেঙ্গে ভেঙ্গে সৈকতে এসে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ফের ঢেউ আসে। ঢেউয়ের পর ঢেউ আছড়ে পড়ে সৈকতে। হঠাৎ একটি প্রশ্ন আমার আনমনা ভেঙ্গে দেয়।

‘স্যার, আফনের নাম কি আকাশ?’

আমার পাশ থেকে প্রশ্নটি করেছে এক কিশোর হকার। ওর হাতে সিগারেটের প্যাকেট। সৈকতে স্থানীয় ছেলেরা সিগারেট, কোমল পানীয় ও অন্যান্য সামুদ্রিক দ্রব্য বিক্রি করে ঠিক, কিন্তু ওরা কারো নাম জানে না বা নাম জিজ্ঞেস করে না। কিন্তু ছেলেটি আমার নাম জানতে চাইছে। সিগারেট কিনবো কিনা জিজ্ঞেস করছে না। আমি সন্দিহান কণ্ঠে বললাম,

‘হ্যাঁ, কেন?’

‘স্যার, আফনেরে ডাকছে।’

‘আমাকে! কে?’

‘ওই যে, এইখানে ছাতার নিচে।’
খানিকটা দূরের একটা ছাতার দিকে হাত তুলে ছেলেটি দেখালো। আমার ডান দিকে প্রায় ৩ শ’ মিটার দূরে একটি রঙ্গিন ছাতার নিচে বসে আছেন একজন নারী। ‘কে সে?’ প্রশ্নটি ছলাৎ করে উঠলো। দূর থেকেও চেনা চেনা লাগছে। মিতা নয়তো! ছাতার নিচে বসে থাকা নারী আমার দিকে চেয়ে আছেন। আমি উঠে দাঁড়ালাম। ইতস্তত করে এগিয়ে গেলাম ছাতাটির দিকে। কিছুটা পথ যেতেই চিনতে পারলাম তাকে। রিমিকে দেখে চমকে উঠলাম। বুকের ভেতরে মোচড় দিয়ে উঠলো যেন সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। আমাকে এগিয়ে আসতে দেখে রিমিও উঠে দাঁড়িয়েছে। তার চোখে এক পশলা বিস্ময়। যেন আমাকে এখানে দেখার কথা ছিল না। হাঁটার সময় কেন জানি দুপুরের রোদে তাতিয়ে থাকা বালির উত্তাপ টের পেলাম না। কাছাকাছি যেতেই রিমি চিৎকার করে উঠলো,
‘আ-কা-শ! দূর থেকেও মনে হচ্ছিলো আপনিই হবেন!’
তার বিস্মিত কণ্ঠে আমিও বিস্মিত হই। যেন হারিয়ে যাওয়া কাউকে পেয়ে গেছেন।
‘আপনি এতো বিস্মিত হচ্ছেন কেন? আমি কি এখানে আসতে পারি না?’
‘আকাশ, আপনি এতোদিন কোথায় ছিলেন?’
তার প্রশ্ন অসংলগ্ন মনে হল। বললাম,
‘কক্সবাজারে আছি আজ প্রায় তিনমাস হলো।’
‘আপনি কাউকেই তো বলে আসেন নি। বিনা নোটিশে নিরুদ্দেশ!’
এ কথায় আমার খানিকটা রাগ হল। বললাম,
‘কেন, কাউকে কি বলে আসার কথা ছিল?’
‘তা নয়, আপনাকে তো তিন মাস যাবতই খুঁজছি!’

‘আমাকে! কেন? আমি তো আপনার কথা রেখেছিলাম। কিন্তু সিমি আমার অনুরোধ রাখেনি। আমাকে তো আর আপনার কোন প্রয়োজন নেই! নতুন কোন প্রয়োজনে খুঁজে থাকলে বলে দিচ্ছি, আমাকে ক্ষমা করবেন, প্লিজ!’

আমার কথায় রিমি হেসে ফেললো। আমি আরো অবাক হলাম। রিমি বললো,

‘আকাশ, আপনাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই।’

‘তবে কার প্রয়োজন?’

‘সিমির প্রয়োজন।’

বুকের ভেতরে মিহিন ভাঙ্গাচোরাটা ফের জানান দিল। সিমির নামটা শোনা মাত্রই আমি কেমন হয়ে গেলাম। কোন কথা বলতে পারলাম না। রিমি মিটিমিটি হাসছে। যেন আমার ভেতরটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। নিজেকে সংযত করে বললাম,

‘সিমির কি হয়েছে! আনিসের সাথে কোন সমস্যা..?’

খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো রিমি। বললো,

‘সিমির সমস্যা আপনাকে নিয়ে।’

‘ঠিক বুঝলাম না। সিমির কি হয়েছে বলুন তো?’

‘সিমিকে নিয়ে দেখছি আপনার অনেক উদ্বেগ!’

‘আপনি কি আমার সাথে রসিকতাই করে যাবেন? সত্যি সত্যি সিমির কোন সমস্যা হয়ে থাকলে আমাকে বলুন।’

‘তার আগে বলুন, সিমির বিয়ের দিন আপনি পালিয়েছিলেন কেন?’

‘পালাই নি। চাকুরি পেয়ে চলে এসেছি।’

‘ও তাই! তা চাকুরি পাবার কথাটা সিমিকে বলতেও তো পারতেন।’

'দেখুন, এ নিয়ে তর্ক করার সময় এখন নয়। তবুও বলছি, সিমির বিয়ের দিন বাসে চড়ার ঠিক আগে আমি আপনাদের বাসায় ফোন করেছিলাম দুটি কারণে। এক ওকে বিয়ের জন্য উইশ করা এবং দুই আমার চাকুরির খবরটা জানানো।'

'সত্যি!'

'হ্যাঁ, আপনার বাবা ফোন ধরেছিলেন। তিনি বললেন, সিমি বিউটি পার্লারে গিয়েছে সাজার জন্য। তাই আর ওকে বলা হয় নি।'

'হ্যাঁ, আমি ওর সাথে ছিলাম।'

'তাহলে? আর বিয়ের পর সিমিকে ফোন করাটা ঠিক হবেনা ভেবে ফোন করি নি। এখন বলুন সিমি কেমন আছে?'

রিমি কোন কথা বললো না। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি তার দু' চোখে জলের ধারা। নারী সহজে কাঁদে ঠিক, কিন্তু অকারণে কেন কাঁদে? বললাম,

'সিমি কি ভালো নেই?'

'না, ও অসুস্থ।'

'কি হয়েছে ওর!'

'ভয় পাবার কিছু নেই। জটিল কোন রোগ নয়। মানসিক বিষণ্নতা। এবং এর জন্য আপনিই দায়ী।'

'আমি!'

'হ্যাঁ, এখন ওকে সুস্থ করুন।'

'আপনি কি বলছেন এ সব! সিমি কি এখানে?'

'হ্যাঁ।'

বুকের ভেতর চেপে রাখা জলপ্রপাতটা নেমে আসতে চাইছে। সিমিকে দেখার ইচ্ছেটাও অদমনীয় হয়ে উঠলো। ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম,

‘আনিসও এসেছে?’
রিমি চোখের জল মুছে বললো,
‘সিমি আনিসকে বিয়ে করেনি। আকাশ, সিমি আপনার অনুরোধ রেখেছে।’
কথাটি বজ্রপাতের মতো লাগলো। ইন্দ্রীয়বোধে মুহূর্তেই একটা ঝড় বয়ে গেল। আমি হা করে তাকিয়ে রইলাম রিমির মুখের দিকে। রিমি আমার হত বিহবল মুখের দিকে চেয়ে বললো,
‘সিমি, বিয়ের দিন পর্যন্ত আপনার ফোনের অপেক্ষা করেছে। বিয়ের দিন বউ সাজার নাম করে ও চলে গিয়েছিল আপনার বাসায়। আমি ওর সাথে ছিলাম। কিন্তু বাসায় আপনাকে আমরা পাই নি। কেউ আপনার খোঁজও দিতে পারলো না। বলুন তো, বিয়ের দিন ঘর পালানো একটি মেয়ের জন্য এ কেমন বিড়ম্বনা?’
আমি মুখে কোন কথা বলতে পারলাম না। নিজের ভেতর সে-কী তোলপাড় চলছে। অস্ফুট কণ্ঠে বললাম,
‘তারপর?’
‘তারপর আর কী, সিমি ও আমি বাসায় ফিরে গেলাম। ওদিকে বর পক্ষ বাড়িতে এসে বসে আছে। সিমি ওর রুমে গিয়ে ঐ যে দরোজা লাগিয়েছিল, আর খুলে নি। সবাই ওর বন্ধ দরোজা দাঁড়িয়ে শুনলো ‘আমি বিয়ে করবো না!’
পুরো বিয়ে বাড়ির লোক থ হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে ফিরে গেল বরযাত্রা। আমার বাবা আর কখনো সিমিকে এ নিয়ে প্রশ্ন করে নি। আমি তো সব বুঝেও চুপচাপ। আপনাকে হন্য হয়ে কত খুঁজেছি! আপনার কোন বন্ধুই আপনার খবর দিতে পারে নি। যার প্রতি অভিমান করে পালিয়ে এলেন, একবারও ভাবলেন না তার কথা! আপনার একবারও সিমির খবর নিতে ইচ্ছে হলো না? আপনাদের পুরুষ মানুষের হৃদয় এতো পাষাণ কেন?’

প্রশ্ন নয়, মনে হচ্ছিলো বড় বড় ঢেউ এসে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অথৈ জলে। আমি রিমির দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। যেন ভাষামূক। রিমি খানিকটা সময় নিয়ে বললো,

‘এরপর থেকে সিমি যেন পাথর হয়ে গেছে। ওর কোন আনন্দ নেই, উচ্ছ্বাস নেই। নিজের মধ্যে ও নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। আমি ওর কষ্টের কারণ জানি। কিন্তু সান্ত্বনা দেবার ভাষা ছিল না। দিনে দিনে ওর মানসিক বিষণ্নতা বাড়ছিল। সিমিকে স্বাভাবিক করতে আমি ও আমার হাজব্যান্ড ওকে নিয়ে এলাম কক্সবাজার। আর কী সুভাগ্য দেখুন, আপনাকে পেয়ে গেলাম!’

তীব্র হাহাকারের ঝড় বইছে মনে। জলপ্রপাত নেমে আসছে প্রবল বেগে। অনুভূতিতে কষ্ট, গ্লানি আর অপার আনন্দের মিশ্রিত ধারা। ‘সিমি’ ‘সিমি’ বলে বুকের ভেতর চাপা কান্নাটা উথলে উঠেছে। ব্যাকুল কণ্ঠে বললাম,

‘রিমি, সিমি কোথায়!’

‘ওই তো, সিমি!’

সমুদ্রের দিকে রিমি হাত উঁচিয়ে দেখালো। দেখতে পেলাম নিঃসঙ্গ সিমি সমুদ্রের জলসীমার খুব কাছে সৈকতে দাঁড়িয়ে আছে। সিমি ও সমুদ্র মুখোমুখি। সিমি নীরব আর সমুদ্র মুখর। ছোট ছোট ঢেউ এসে ওর পা ভিজিয়ে দিচ্ছে। ওর খোলা চুলগুলো উড়ছে হিমেল হাওয়ায়। সৈকত জুড়ে এতো হৈ-চৈ, কোলাহল, সেদিকে ওর কোন মনযোগ নেই। রিমি বললো,

‘আপনি ওর কাছে যান। আপনাকে দেখলে ও ভীষণ চমকে যাবে। আমি হোটেলে যাচ্ছি। আমার হাজব্যান্ডকে খবরটা দিয়ে আসছি।’

রিমি হন হন করে হেঁটে চলে গেল হোটেলের দিকে। আমি এগিয়ে গেলাম সিমির দিকে। পরাজিত নয়, বিজয়ী মানুষের মতো আমার পা চলছে।

১৪

সুনীল গঙ্গোপধ্যায়ের কবিতা সিমি'র খুব পছন্দ। আমার পছন্দ নির্মলেন্দু গুণের কবিতা। সিমি সুনীলের অনেক কবিতাই আবৃত্তি করতো। এ মুহুর্তে আমার ইচ্ছে করছে ওর পাশে দাঁড়িয়ে বলি, 'যমুনা হাত ধরো, স্বর্গে যাবো..'। এই কবিতার এই এক লাইন ছাড়া আর কোন লাইন মনে পড়ছে না। আমি এরচেয়েও আরো যোগসূত্রপূর্ণ কোন কবিতা খুঁজতে লাগলাম। আমার স্মৃতির স্টকে তেমন কবিতা নেই। সিমির পাল্লায় পড়ে অনেক কবিতা পড়েছি বা আবৃত্তি শুনেছি। কিন্তু ওসব কবিতা মনে রাখতে পারি নি। এ নিয়ে আমার আফসোস নেই। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, দু' চারটি রোমান্টিক কবিতা মুখস্থ রাখা উচিত ছিল। জীবনের কোন বিশেষ মুহুর্তে তা ভীষণভাবে কাজে লাগতে পারে। এখন আমি সিমিকে ভীষণরকম চমকে দিতে চাই। হাঁটতে হাঁটতে সিমির কাছে চলে এলাম, কিন্তু যুতসই কবিতা মনে আসছে না। নিজে নিজেই কয়েক লাইনের কবিতা তৈরি করার চেষ্টা করতে লাগলাম। প্রত্যেক মানুষ নাকি কখনো কখনো কবি হয়ে যায়। কিন্তু আমার মধ্যে কবিতা আসছে না। সিমি সমুদ্রের দিকে চেয়ে আছে। আমি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। কয়েকটা মুহূর্ত অপেক্ষা করলাম। সিমি সমুদ্রের দিকে তাকিয়েই আছে। ছোট্ট করে ডাকলাম,

'সিমি!'

যেন বিদ্যুত চমকালো। এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়ালো ও। আমার মুখোমুখি। বিস্ময় ভরা দু' চোখ। আমি স্বাভাবিক গলায় বললাম,

'আমাদের সম্পর্কের একটা নাম দিতে চাই।'

সিমির শরীর যেন কাঁপছে। মানুষের চোখে কতটা বিস্ময় থাকতে পারে? সিমির দু' চোখ বিস্ময়ে ফেটে যেতে চাইছে। আমি ওর বিস্মিত চোখে চোখ রেখে বললাম,

'কেমন আছো?'

যেন এই প্রশ্নটির জন্যই ও জমাট বেধে ছিল। এতেই গলে পড়লো অভিমান । ওর দু' ঠোঁট তিরতির করে কাঁপছে। দু' চোখ নদী হয়ে গেল। অশ্রুপাতের সামনে আমি চুপসে যাই। কান্না কি সংক্রামক ব্যাধি? আমার ভেতরেও কান্নার রোল। আমি দু' হাত বাড়িয়ে আলতো করে ওর অশ্রুভেজা গাল ছুঁয়ে দিলাম। ও আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলো না। ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার বুকে। আমি দু' হাতে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। এই প্রথম ওকে জড়িয়ে ধরা। ওর শরীরের কাঁপুনি বেড়ে গেল। ও আমার বুকে মুখ ঘষে কাঁদতে লাগলো। এই কান্না বেদনার, না আনন্দের, তা বলা মুশকিল। আমি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম,

'একটিমাত্র অনুরোধেই আমাকে জিতিয়ে দিলে!'

ও কিছু বললো না। আমি আবার বললাম,

'শুধু একটিমাত্র অনুরোধেই আমাকে জিতিয়ে দিলে, কেন?'

এবার ও আমার বুক থেকে মুখ তুললো। কপট রাগের ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো,

'নিজেকে ঠকাতে চাই নি বলে তোমাকে জিতিয়ে দিয়েছি।'

'এটা কি আমার প্রতি তোমার করুনা, না অনুরাগ?'

'রাগ-অনুরাগ কি তুমি বুঝো?'

সিমি রেগে গেল। ওর রাগকে উপেক্ষা করে বললাম,

'যদি না বুঝি, তাহলে শেখাও।'

'এখন থেকে শেখাবো। সারাটা জীবন শেখাবো।'

বলে সিমি আমাকে দু' হাতে শক্ত করে ধরে ফেললো। মনে হচ্ছে, ছেড়ে দিলেই আমি পালিয়ে যাবো। আমি ওর মুখ তুলে কপালে একটা চুমু খেলাম। এ আমার প্রথম চুমু, ভালোবাসার স্পর্শ। আমার দু' হাতের বন্ধনে কুঁড়ির পাপড়ি মেলার মতো ও ফুটতে থাকলো।

নিউইয়র্ক
০২/৫/০৪